শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত

বিজ্ঞানাঙ্গন

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা জুলাই ২০২০

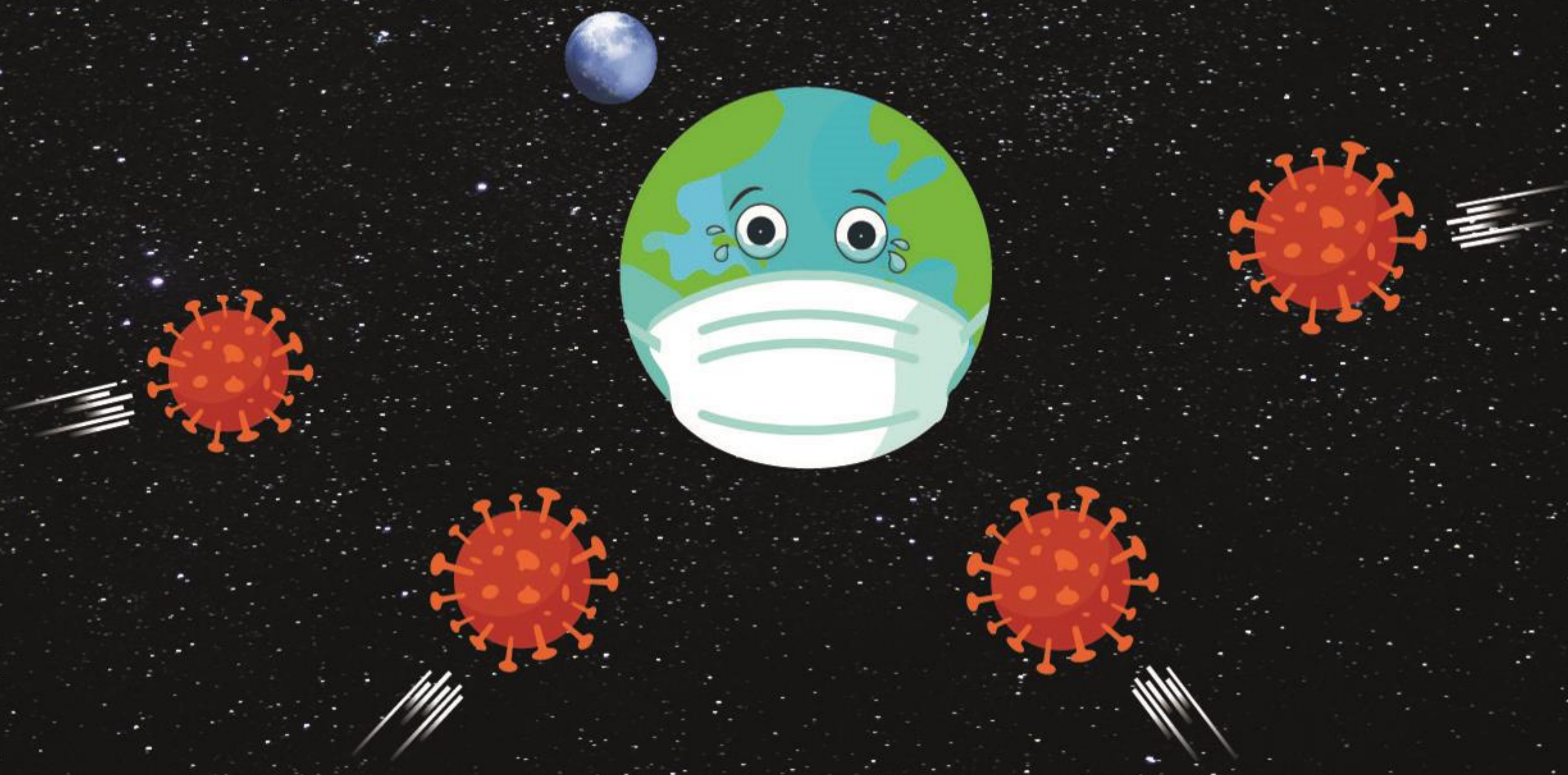

করোনা ভাইরাস

বিবর্তন তত্ত্ব

জ্যোতির্বিজ্ঞান আপডেট

সমুদ্রবিজ্ঞান

সায়েন্স ফিকশন

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত

বিজ্ঞানাঙ্গন

বর্ষ ১ · সংখ্যা ১
জুলাই ২০২০
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৭ · জিলক্বদ-জিলহজ্জ ১৪৪১

সম্পাদক
মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল
সহ-সম্পাদক
ইসরাতুল মারিয়া, তামরিন জাহান

প্রচ্ছদ
মো. আশিকুর রহমান আসিফ, মো. জিহান হাসান
ডিজাইন ও লেআউট
মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা
নুসরাত জাহান সিফাত

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল,
শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব

প্রকাশকাল: জুলাই ১০, ২০২০
মূল্য: বিনামূল্য (০০ টাকা)

সম্পাদকীয়

বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালে শিক্ষা ওয়েবের একটি ক্লাব হিসেবে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব। তখন থেকেই একটা ই-ম্যাগাজিন তৈরির তাগিদ অনুভব করলাম। তবে ঝুঁকি নেয়ার মত যথেষ্ট সময় ছিল না টিমের কারো হাতেই। তাই এই কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেই একদল বিজ্ঞানপ্রেমীর সহায়তায় সেই অসমাপ্ত কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করলাম (আলহামদুলিল্লাহ)।

এ সংখ্যায় গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মাসের পর মাস জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খেঁটে যাওয়া চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীসহ সকলের প্রতি।

আজ (১০ই জুলাই) এক বিশেষ দিনও বটে। এই দিনে মহান বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা জন্ম গ্রহণ করেন। তার প্রতিও রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

প্রথম সংখ্যা, তাই অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। আশা করছি পাঠকগণ সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

- মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

প্রকাশক, বিজ্ঞানাঙ্গন
প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব

ইমেইল: editor@bigganangon.shikkhaweb.com
ওয়েবসাইট: https://bigganangon.shikkhaweb.com
বিজ্ঞান ক্লাবের ওয়েবসাইট: https://scienceclub.shikkhaweb.com
বিজ্ঞান ক্লাবের পেইজ: https://www.facebook.com/ShikkhaWebSC
বিজ্ঞান ক্লাবের গ্রুপ:
https://www.facebook.com/groups/223266018416378

সূচিপত্র

করোনা ভাইরাস

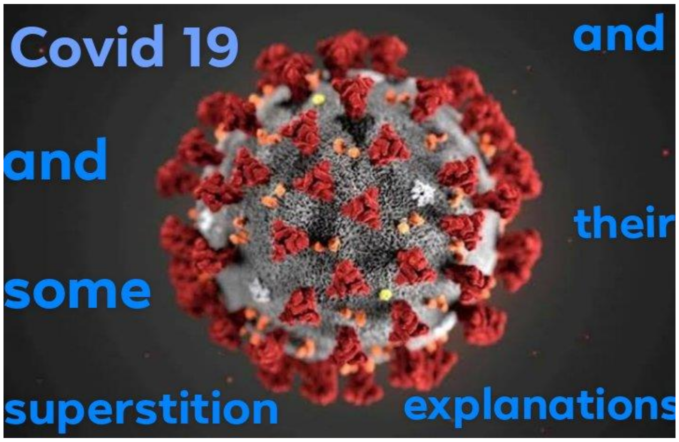

কোভিড-১৯ এবং কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও সেসবের ব্যাখ্যা
ফারহান কবির ২২

কোভিড-১৯ সময়কালীন বিশ্বের কিছু চিত্র
মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল ৪০

করোনা ভাইরাসে পুরুষের আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার মহিলাদের চেয়ে বেশি কেনো?
ফারহান কবির ৫৫

ফিচার

পিকআপ কথন ৫১
অস্তিত্ব ১১
সমুদ্রের গল্প ১৪
জীবের বিকাশধারা ও বিবর্তন ০৬

নিয়মিত বিভাগ

জীবনী
- নিকোলা টেসলা ৬৩

পদার্থবিজ্ঞান ২৬
গণিত ৫৮
জীববিজ্ঞান
- ওহমের সূত্র যখন আমাদের রক্তনালীতে ৪৮
- রক্ত ৪২

কুইজ ৩৮
সায়েন্স ফিকশন ৩৫
জ্যোতির্বিজ্ঞান ৩৪
মনোবিজ্ঞান ১৯
বই রিভিউ
- ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা ৪৭

প্রযুক্তি ৬৭

জানা-অজানা

নীলের রহস্য ৬১
কার্নিভোরাসের দঙ্গলে ২৯

bdwebs.com
Web Design & Software Solution

01721495878
01841495878

ওয়েব সাইট ডিজাইন ও ডোমেইন হোস্টিং
জগতে বিশ্বস্ততার সাথে ১ যুগ ধরে

আমাদের সার্ভিস সমূহঃ

- **Website Design** (eCommerce, News, Business)
- **Domain Name Registration, Domain Reseller**
- Web Hosting, **Reseller** Hosting, **VPS/RDP Hosting**
- Software License (**cPanel**, WHMCS, Jetbackup, Softaculous)
- Software (**Pos, Multi-Purpose, School Management**)
- **Bulk SMS** (Masking and Non-masking)
- Facebook Marketing/**Boosting**.

জীবের বিকাশধারা ও বিবর্তন

মোঃ আবিদুল ইসলাম

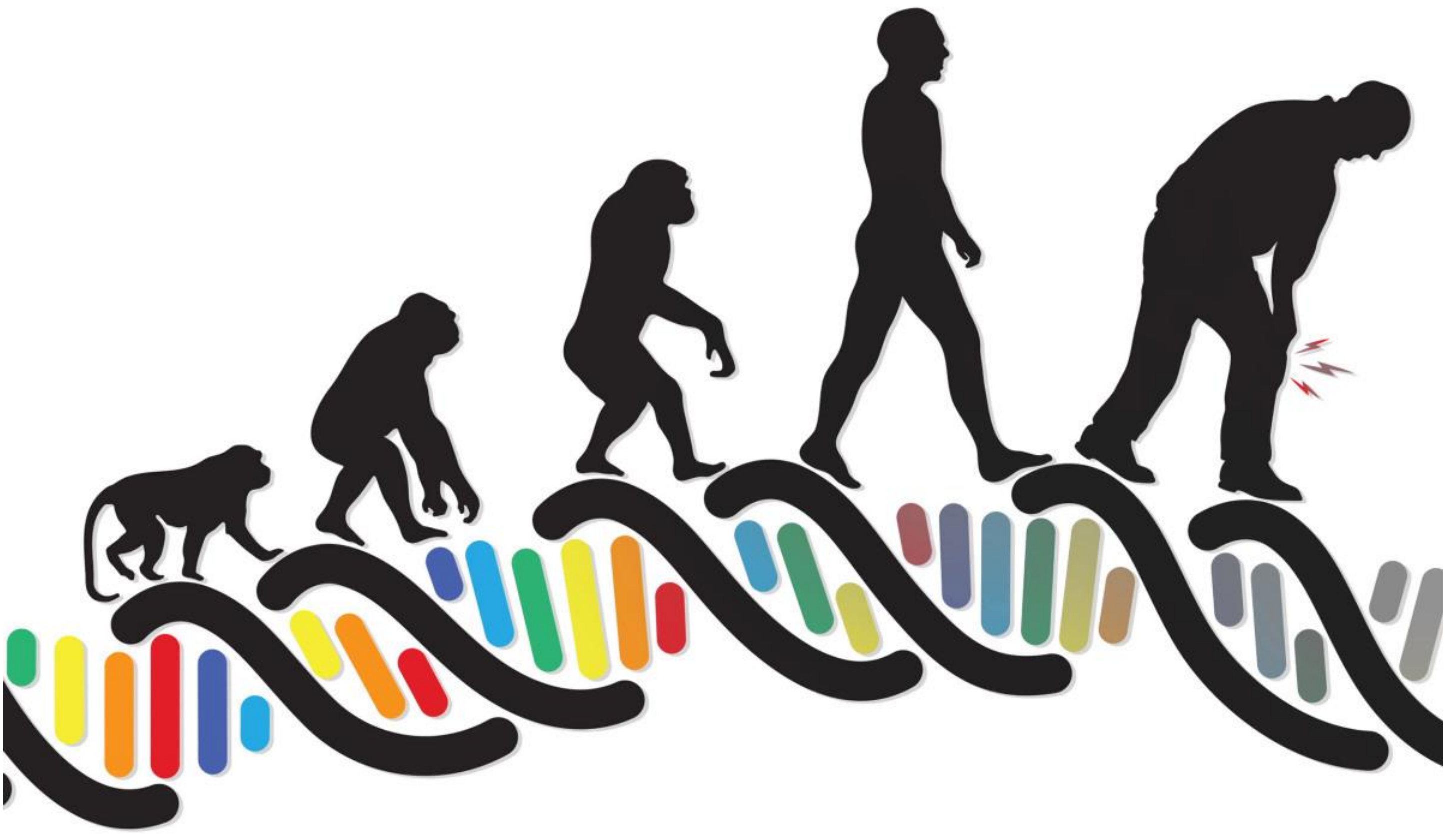

বিবর্তন বা ইভোলিউশন শব্দটি আগে কখনো শোনেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিবর্তন কি জিনিস সেটা না বুঝলেও বানর থেকে মানুষ আসার গল্প আর সেটাকে গালমন্দ করার অভিজ্ঞতা অন্তত সকলেরই আছে। এই বিবর্তনের ফসল আজকের পৃথিবী আর আমরা এবং পৃথিবীতে বাস করা প্রতিটি জীব।

বিবর্তন কি?

আগে জেনে নিই বিবর্তন কি জিনিস। বিবর্তন হচ্ছে এমন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি স্পিশিজ বা প্রজাতির প্রানিদের দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তন প্রতি প্রজন্ম ধরে চলমান থাকে। মোটামুটি একটি প্রজাতির মাঝে একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের

প্রকাশ পেতে ৩.৫ মিলিয়ন বছর সময় লাগে। এই বিবর্তন শব্দটিকে আমাদের মাঝে পরিচিত করে তোলেন প্রকৃতি ও জীব বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। ১৮৫৯ সালে তার প্রকাশিত 'দ্যা অরিজিন অব স্পিশিজ' বইতে তিনি এর উল্লেখ করেন।

কিন্তু তিনি একথা কখনই বলেননি যে মানুষ বানর থেকে এসেছে। অধিকাংশ মানুষ ভুল ব্যখ্যা দিয়ে থাকেন।

আর্টিকেলের পরবর্তী অংশে সঠিক বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

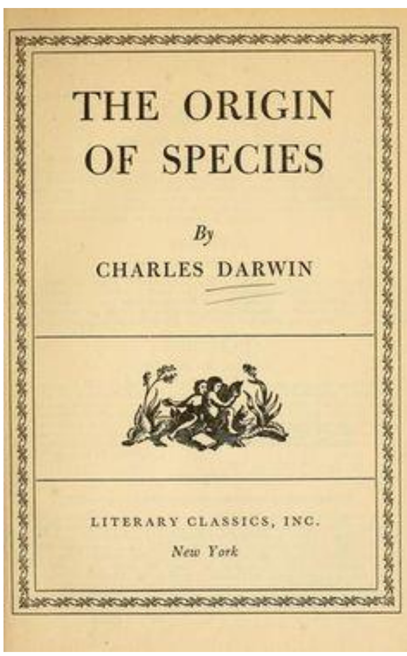

ডারউইনের অরিজিন অব স্পিশিজ বই

বিবর্তন নিয়ে কথা বললেই একটি প্রশ্ন আসে আর সেটি হল একই প্রজাতির জীবেদের মধ্যে এত তারতম্য কেন? একই তো কুকুর কিন্তু এক জাতের সাথে অন্য অন্য জাতের বিশাল ফাঁরাক, মনে হবে যেন দুই ভিন্ন প্রজাতি। যত কম বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করে এই গোটা জিনিসটা সহজভাবে ব্যখ্যা করা যায় তারই চেষ্টা করবো।

বিবর্তন ঘটার অনেক ধরণ আছে। আর সেই ধরণগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহার না করেই নিজের ভাষায় ব্যখ্যা করছি।

১ম ধরণ

ধরুণ আফ্রিকার কোন এক জায়গায় মানুষের একটি জাতের বসবাস যার নাম হোমো-১। দীর্ঘদিন সেখানে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকার পর একদল সদস্য কোন এক অজানা কারণে সেই এলাকা ছেড়ে দিতে চাইল। তো সেই ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু সদস্য নতুন এক বাসস্থানের খোঁজে রওনা দিল আর এক সময়ে ইউরোপে এসে পৌছাঁল এবং সেখানে বসবাস শুরু করল। ইউরোপের আবহাওয়া ভিন্ন হওয়ার কারণে সেখানে বেঁচে থাকার জন্য ভিন্ন কৌশল, ভিন্ন খাদ্যভ্যাস ও ভিন্ন দৌহিক আকৃতির প্রয়োজন ছিল। হোমো-১ এর সেই সদস্য ধীরে ধীরে নতুন এক রূপ পেতে লাগলো। প্রতিবার যখন নতুন কোন প্রজন্ম আসে তখনই পরিবেশের কারণে তাদের মাঝে কিছু পরিবর্তনও আসে। যেটা চোখের দেখায় বোঝা যাবে না।

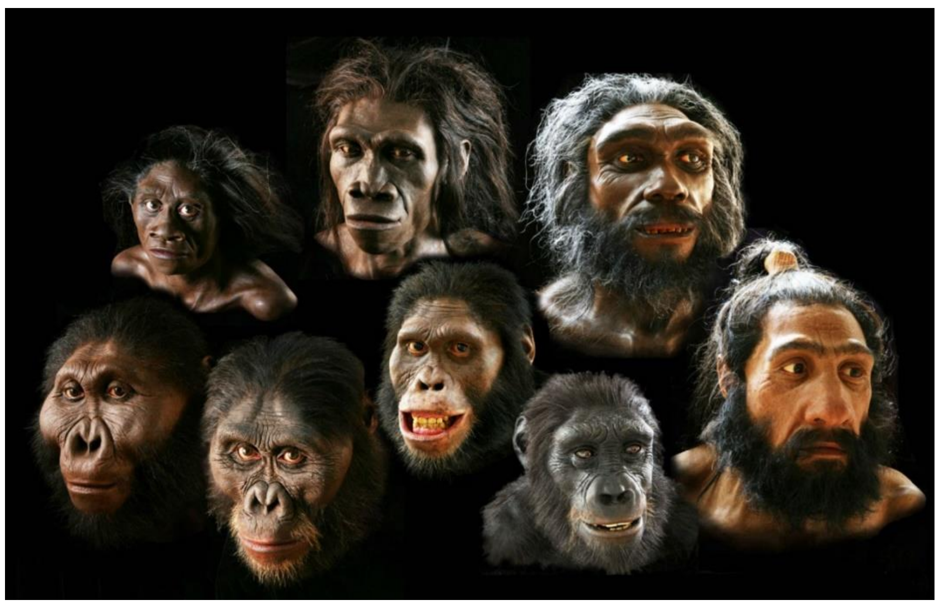

মানুষের বিবর্তনকালের বিভিন্ন সময়ের চিত্র

এভাবে এক সময় দেখা গেল হোমো-১ এর সেই সদস্যরা আর তাদের আফ্রিকায় ফেলে আসা হোমো-১ এর মতো নেই। তারা সম্পূর্ণভাবে অন্য এক জাত। তাই তাদের নাম দিলাম হোমো-২। আফ্রিকায় হোমো-১ তো আছেই। কোন এক জায়গায় দেখা গেল আবার হোমো-১ ও হোমো-২ এর কিছু সদস্যের দেখা হল। তারা আবার একসাথে থেকে গেল এবং নিজেদের মাঝে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলো। আর জন্ম

দিল নতুন এক মানব প্রজাতি যার নাম হোমো-৩। ঠিক যেভাবে গাঁধা আর ঘোড়ার মিলনে খচ্চর হয়। এভাবে পৃথিবীতে অনেক জীবের বিবর্তন ঘটেছে আর জন্ম নিয়েছে নতুন জাতের।

২য় ধরণ

ফিঞ্চ পাখির নাম হয়তো শুনেছেন বা দেখেছেন। না দেখে থাকলে আপনাদের জন্য ছবি দিয়ে দিচ্ছি। এই পাখির গল্পটাই বলবো এখন।

ফিঞ্চ পাখি

এই পাখির জন্ম হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে। সেই দ্বীপ তাদের জন্য খাদ্য স্বর্গ ছিল, খাবারের কোন অভাব নেই। আর তাদের শিকার করার জন্যেও কেউ নেই। ফলে খুব দ্রুত তাদের বংশবিস্তার হতে থাকলো। আর একসময় শুরু হল খাদ্যাভাব। খাবারের যোগান পেতে একটি ফিঞ্চ আরেকটি ফিঞ্চের শত্রুতে পরিণত হতে লাগলো। মূল পরিবর্তনটা এখানেই।

এই অভাবের কারণে একদল ফিঞ্চ শুধু কেঁচো ও অন্যান্য পোকামাকড় খাওয়া শুরু করলো। আরেকদল বিভিন্ন গাছের বীজ, ফল-মূল খাওয়া শুরু করলো। মানে খাদ্যাভাসের ভিত্তিতে দুটি জাতের তৈরি হল। আর খাদ্যের ধরণ পাল্টে গেলে জীবের মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এখানেও তাই হল। আর তিন ধরণের যৌন সম্পর্ক দেখা গেল।

- কেঁচোখেকো পুরুষ – কেঁচোখেকো নারী
- কেঁচোখেকো পুরুষ – বীজখেকো নারী
- বীজখেকো পুরুষ – বীজখেকো নারী

খুবই স্বাভাবিক এই তিন ধরণের যৌন সম্পর্ক থেকে একই ধরণের সন্তান জন্ম নিবে না। কিন্তু তার মানে এটাও না যে সাথে সাথেই একেবারে অন্য জাতের পাখি জন্ম নিবে। এটা হচ্ছে বিবর্তনের ১ম ধাপ। এভাবে এই ৩ ধরণের সন্তানের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হবে আর শুধু খাদ্যাভাস না, শিকারের ধরণেও পরিবর্তন আসবে। দেখা যাবে কিছু ফিঞ্চ হয়তো বীজ আর কেঁচো দুটোই খাচ্ছে। এভাবে অনেক অনেক প্রজন্ম পরে দেখা যাবে ভিন্ন জাতের কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে। অর্থ্যাৎ একই জাতের এই পাখিদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য দেখা যাবে। পার্থক্য এতোটাই বেশি হবে যে মনেই হবে না এরা কোন এক সময়ে একই রকম ছিল।

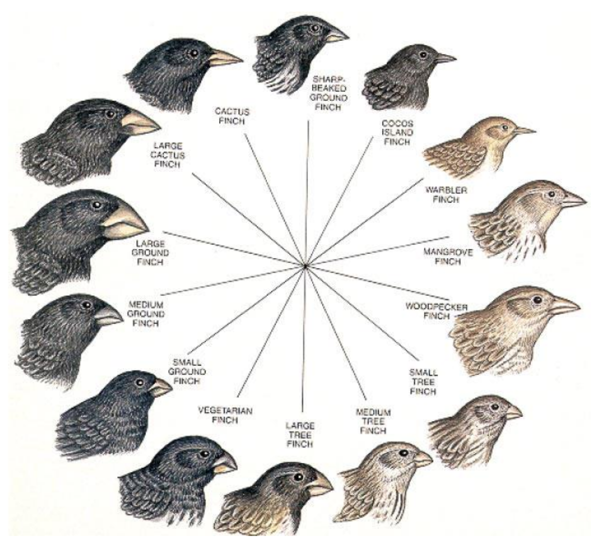

ফিঞ্চ পাখির বিভিন্ন জাত

আর তখন ভিন্নতার প্রকটে তারা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে, নিজেদের আর এক মনে করবে না। এভাবেই বর্তমানে ফিঞ্চ পাখির ১৪টি প্রজাতির বিচরণ। শুধু

ফিঞ্চ নয় অসংখ্যা প্রানির বিবর্তন ঘটেছে এভাবে আর আজ তারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই সুন্দর পৃথিবীতে।

৩য় ধরণ

এই ধরণকে অবাধ যৌনতা বললে ভুল হবে না। একই প্রজাতির অন্তর্গত জীবেদের মধ্যকার যৌন সম্পর্ককেই আমি ইঙ্গিত করছি আমি। এখন যদি আপনি হাঁস ও মুরগীর যৌন সম্পর্ক ঘটাতে চান তবে প্রাকৃতিক ভাবে সহসাই তা হবে না। কৃত্রিম ভাবে হতে পারে আর প্রাকৃতিক ভাবে হতে হলে সঙ্গিনীর অভাব বা বিপর্যস্ত পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে।

হাঁস আর মুরগী কোন এক সময় হয়তো একটি প্রানিই ছিল কিন্তু বিবর্তনের ধারায় তারা আজ দুটি ভিন্ন প্রানি। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিবর্তনগুলো ঘটেছে একই জাতীয় প্রানিদের মধ্যকার যৌন সম্পর্ক ও তার ফলে জন্ম নেওয়া নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রানের কারণে।

আগে বুঝতে হবে স্পিশিজ বা প্রজাতি কিসের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা হয়। ডিএনএ কম্বিনেশন, রি-প্রোডাকশন সিস্টেম ও সাধারণ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে। প্রজাতির প্রানিগুলোর ক্রমোসোম সংখ্যা একই থাকার কারণে তারা যদি যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তবে সন্তান জন্ম অবশ্যই নিবে।

পৃথিবীতে জীবের প্রাক্কালে প্রানিজগতে এতো বৈচিত্র্যতা ছিল। প্রজাতির মাঝে প্রানির ভিন্নতা ছিল না বললেই চলে। সবাই একই রকম ছিল ফলে যৌনতাও খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে একই প্রজাতির দুটো প্রানি একেবারে আলাদা, এমনকি তারা নিজেরাও নিজেদের এক বলে ভাবতে পারে না তাই প্রাকৃতিক মিউটেশন কমে গিয়েছে।

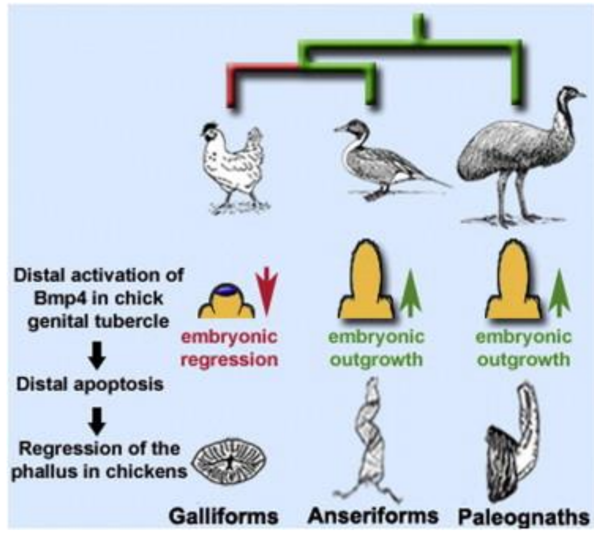

হাঁস ও মুরগীর বিবর্তনীয় বংশধারা

বাঘ সিংহের যৌন মিলনে সৃষ্ট জীবধারা

গরু আর ছাগলের ক্রমোসোম সংখ্যা আর সেক্সুয়াল অরিয়েন্টশন কিন্তু এক। তাদের মধ্যে যদি যৌন সম্পর্ক ঘটে তবে সন্তানও হবে। কিন্তু উচ্চতার তারতম্যের কারণে তাদের মাঝে এ সম্পর্ক দেখা যায় না।

বর্তমানে এসব নিয়ে গবেষণাও অনেক হচ্ছে। বাঘ আর সিংহের মিলনে টাইগন আর লাইগার নামের দুটি নতুন ধরণের প্রানির আবিষ্কার করা হয়েছে। পুরুষ বাঘ ও নারী সিংহের মিলনে জন্ম নেয় টাইগন। আর পুরুষ সিংহ ও নারী বাঘের মিলনে জন্ম নেয় লাইগার। এই টাইগন ও লাইগারের যৌন মিলনের ফলেও আবার সন্তান জন্ম নিবে। এভাবেই এক জাতীয় প্রানি থেকে বিবর্তনের ধারায় অনেক প্রানির আগমন ঘটে।

৪র্থ ধরণ

সবসময় যে বিবর্তনের ফলে নতুন জাতের সৃষ্টি হয় তা কিন্তু না। একই প্রানি বিবর্তনের ধারায় ও পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার তাগিদে বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে নিজের রূপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমনঃ আদিম মানুষেরা লোমশ প্রকৃতির হত। কারণ তাদের উন্নত বস্ত্র ও বাসস্থান ছিল না। খোলা পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অন্য প্রানিদের মতো তাদেরও তাই লোমশ দেহের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষের লোমশ দেহের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বিবর্তন ঘটেছে কিন্তু একেবারে নতুন কোন জাতির সৃষ্টি হয় নি।

আবার কোন একটি প্রজাতির প্রানির যদি নির্দিষ্ট কোন ইচ্ছা থাকে আর সেই ইচ্ছা যদি এক প্রজন্মের থেকে পরের প্রজন্ম বয়ে বেড়ায়, তবে বিবর্তনের ধারায় সেই ইচ্ছার বাস্তব প্রতিফলনেরও দেখা মেলে। নিচের অংশটি পড়লে বুঝতে পারবেন।

ডারউইন থিওরি টা এরকম ছিল-

প্রায় ৫০-৫৫ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে প্রাইমেট নামের একটি প্রাণির অস্তিত্ব ছিলো। এই প্রাইমেট দুইবার বিবর্তিত হয়। এবং দুইটি প্রাণির জন্ম দেয়। একটি বানর, অপরটির নাম এপ। বানর আর এপের পার্থক্য ছিলো একটাই। বানরের লেজ ছিলো কিন্তু এপের লেজ ছিলো না। এই এপ থেকেই বিবর্তিত হয়ে আসে আজকের মানুষ।

অর্থ্যাৎ,

মানুষ বানর থেকে আসেনি। বানর ও মানুষ উভয়ই প্রাইমেট থেকে এসেছে।

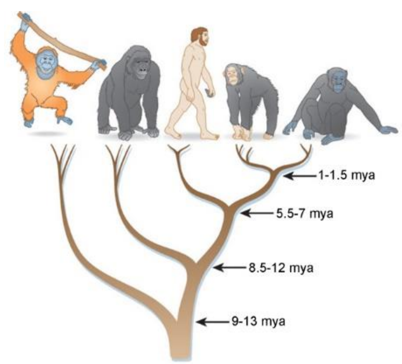

হিউম্যান ইভোলিউশনাল লাইনেজ

এপ কিন্তু সোজা হয়ে হাঁটতে পারতো না। কিন্তু তাদের মাঝে সোজা হয়ে হাঁটার ইচ্ছে ছিল যেটা প্রতিটি প্রজন্ম ধারণ করে গেছে এবং এক সময় তারা সোজা হয়ে হাঁটা শিখে গেছে। আবার ডলফিন কিন্তু শুরুতে জলের প্রানি থাকলেও বিবর্তনের ফলে ডাঙার প্রানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডাঙায় আর থাকেনি। আবার বিবর্তিত হয়ে তারা পানিতেই ফিরে যায়। এটা ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে বিবর্তিত হওয়ার বেশ উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বিবর্তনের একেবারে বেসিক জিনিসগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আশা করি ভালো লেগেছে। বিশদ জ্ঞান অর্জনের জন্য *'ইউভাল নোয়া হারারি'*র 'সেপিয়েন্স' বইটা পড়তে পারেন।

ধন্যবাদ।

অস্তিত্ব

সামা জামিলা রহিম

জীবন শব্দটাতে কি কেবলই মানুষের অধিকার?

জীব যেখানে জীবন সেখানে। হাবল টেলিস্কোপের ভরসায় বলা যায়, মহাবিশ্বে ১০০ বিলিয়নের মতো ছায়াপথ আছে। আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের আরও ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্ররাজির এক জ্বলজ্বলে সদস্য হলেন সূর্য। আমরা মানুষ, সেই সৌর পরিবারের তৃতীয় সদস্য পৃথিবীর প্রায় নব্বই লাখ প্রজাতির একটি। তবুও পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের তকমা নিয়ে দিব্য ঘুরে বেড়াচ্ছি যতক্ষণ না একটা প্রশ্ন মাথায় টোকা দেয়,

"এই ব্রহ্মাণ্ডে কি আমরা একা?"

ফ্র্যাঙ্ক ড্রেইকের সূত্রানুযায়ী, প্রত্যেক ছায়াপথে সর্বোচ্চ একশ মিলিয়ন মহাজাগতিক সভ্যতা থাকার কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত কারোর টিকিটির-ও হদিস মিলে নি।

তাহলে "**কোথায় সবাই?**"

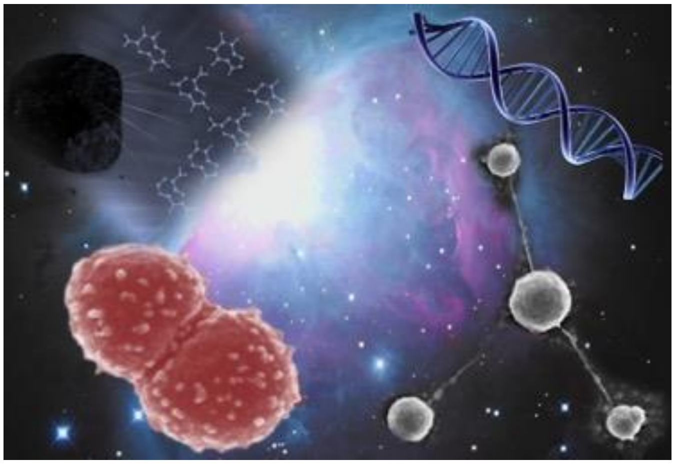

এই প্রশ্নই করে গেছেন এনরিকো ফার্মি, তার বিখ্যাত 'ফার্মি প্যারাডক্স'-এ। ফার্মি প্যারাডক্সের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিছু সম্ভাব্য দিক উঠে আসে, হয় আমরা আসলেই এ ব্রহ্মান্ডে একা রাজ করছি অথবা মহাজাগতিক সভ্যতাগুলো এতই উন্নত যে আমরা তাদের ছুঁতে পারছি না কারণ তারা চাইছে না কিংবা আমাদের প্রযুক্তিগত খামতি আছে।

পৃথিবী বাদে মহাবিশ্বের আর কোথাও প্রাণের সঞ্চার আছে কি না তা খতিয়ে দেখতেই জ্যোতির্জীববিজ্ঞানের (অ্যাস্ট্রোবায়োলজি) আবির্ভাব। ১৯৯৫ সালের দিকে নাসা প্রথম অ্যাস্ট্রোবায়োলজি নিয়ে কোমড় বেঁধে কাজ শুরু করে।

মহাবিশ্বের যাবতীয় জীবিত প্রজাতির অস্তিত্ব, প্রকৃতি নিয়ে যা ধারণা দেয় সেটাই জ্যোতির্জীববিজ্ঞান। যদিও ভূতত্ত্ববিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতির সমন্বয়ে অ্যাস্ট্রোবায়োলোজি। মূলত অন্যান্য গ্রহ কিংবা সৌরজগতের বাইরে কোথাও "লাইফ বিল্ডিং ব্লকস" আছে কি না তা নিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন অ্যাস্ট্রোবায়োলোজিস্টরা।

মঙ্গল গ্রহে আদৌ কোনো প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না তা যাচাই করতে নাসা ১৯৭০ সালে 'ভাইকিং' নামক এক মিশন শুরু করে। অণুজীব কালচার (সৃষ্টি) করার মাধ্যমে মঙ্গলপৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্ব বোঝার চেষ্টা করা হয়েছিলো এ মিশনে। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে প্রাণীর বাসযোগ্য পরিবেশ খোঁজা শুরু করলো নাসা। এবং "পানিকে অনুসরণ" করার নীতিকে কাজে লাগিয়ে এখনো নাসা কাজ করে যাচ্ছে। মূলত তখন থেকেই অ্যাস্ট্রোবায়োলজির চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

১৯৭৭ সালের দিকে পৃথিবীতে চরমপন্থী পরিবেশের খোঁজ করতে গিয়ে কিছু অভাবনীয় প্রজাতি দেখা যায় যা গবেষকদের পিলে চমকে দেয়। "গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপ"-এর কাছে সমুদ্রতলে টিউব ওয়ার্মের সন্ধান মিলে যেগুলো বিষাক্ত পরিবেশে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে দিব্য কেমোসিনথেসিসের মাধ্যমে বেঁচে আছে। এদেরকে বলা হয় 'এক্সট্রিমোফিল'। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের টনক নাড়িয়ে দেয়ার জন্য এরা যথেষ্ট ছিলো। কেননা এত উচ্চ তাপমাত্রায়, অম্লীয় পরিবেশে যদি প্রাণের দেখা পাওয়া যায় তবে মঙ্গল গ্রহ কিংবা অন্য এক্সোপ্ল্যানেট-গুলোতেও প্রাণের বিস্তার অসম্ভব কিছু না। এদিকে ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে সৌর পরিবার বহির্ভূত একটা গ্রহের দেখা মিলে, গ্রহটি তার নিজস্ব নক্ষত্রকে পরিক্রমণ করে। এরকম সৌরপরিবার বহির্ভুত গ্রহকে বলে এক্সোপ্ল্যানেট।

চিত্র: এক্সট্রিমোফিল (টিউব ওয়ার্ম)

পৃথিবী সৌরজগতের এমন এক অবস্থানে আছে যার তাপমাত্রা অত্যাধিক গরম নয় আবার প্রচন্ড ঠান্ডাও নয়, এই অঞ্চলকে বলে "হ্যাবিটেবল জোন" অর্থাৎ বাসোপযোগী অঞ্চল। এ পর্যন্ত তিন হাজার সিস্টেমের প্রায় চার হাজার এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পরিসংখ্যান বলছে,

প্রতি পাঁচটি সূর্যের মতো নক্ষত্রের মধ্যে অন্তত একটি করে নক্ষত্রের হ্যাবিটেবল জোনে পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ আছে।

ইতোমধ্যেই কার্বনডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন এবং অন্যান্য বস্তু যেগুলো প্রাণ সঞ্চারের ইঙ্গিত দেয় সেগুলো এক্সোপ্ল্যানেটে পাওয়া গেছে। শুধু অক্সিজেনের ঘনমাত্রা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া গেলেই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে আদৌ গ্রহগুলো প্রাণ সঞ্চারের ক্ষমতা রাখে কী না।

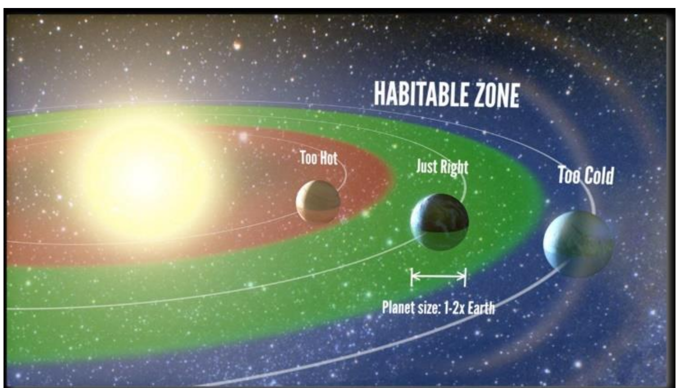

The habitable zone corresponds to the range of orbital distances where liquid water can exist on a planet's surface.

অ্যাস্ট্রোবায়োলজি নিয়ে যখন গবেষণা থিতিয়ে পড়ছিলো ঠিক তখনই পরপর এমন কিছু খবর আসতে থাকে যা আবার গবেষণাকে চাঙ্গা করার জন্য যথেষ্ট ছিলো। প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কারের পরের বছরই নাসার ' গ্যালিলিও স্পেইসক্রাফট' বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার ছবি পাঠাতে থাকে। ইউরোপা-র পৃষ্ঠে কৌতূহলোদ্দীপক বরফের স্তর দেখা যায়। ২০১৩ সালের শুরুর দিকে "কেক-২ টেলিস্কোপ" এর সাহায্যে বোঝা যায় ইউরোপার সমুদ্র উপগ্রহ পৃষ্ঠের দিকে ধাবিত হচ্ছে এর পৃষ্ঠ ফাটলগুলোর মাধ্যমে। একই বছরে শেষের দিকে হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায়, ইউরোপার দক্ষিণ মেরু থেকে পানি এমনভাবে ছিটকে পড়ছে যেন ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে শনি গ্রহের উপগ্রহ এনসেলেডাসকেও বরফকুন্ড হিসেবে ধারণা করা হতো। কিন্তু "ক্যাসিনি" সে ধারণায় নতুন মাত্রা যুক্ত করে। এনসেলেডাস থেকেও ইউরোপার মতনই তরল ছিটকে পড়ছিলো পৃষ্ঠীয় ফাটলগুলো থেকে। বৃহস্পতি কিংবা শনি দৈত্যাকার গ্যাস পিন্ড হওয়া সত্ত্বেও, এতে নিরেট পৃষ্ঠের খামতি থাকলেও হয়তো এর ভেতরে তরল পানির অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, এমনটাই ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা।

শুধু বৃহস্পতি বা শনি নয়, মঙ্গল নিয়ে যত গবেষণা তাতেও বেশ চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। ২০০০ সালে "ফিনিক্স" ল্যান্ডার মঙ্গল গ্রহের উত্তরাংশে বরফের সন্ধান দেয় যার থেকে ধারণা করা হয়, মঙ্গলের তলদেশে পানির অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে। পরবর্তীতে "অপরচুনিটি" ও "স্পিরিট" নামক রোভার দুটি মঙ্গলে কার্বোনেট এবং বিভিন্ন ধরণের খনিজের উপস্থিতি টের পায়। "কিউরোসিটি" নামক আরেকটি রোভার এমন কিছু তথ্য দেয় যার মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহে যে পূর্বে কোনো এক সময় প্রাণের বিস্তার ছিলো তার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

চিত্র: শনির উপগ্রহ এনসেলাডাস থেকে ছিটকে পড়ছে তরল

পৃথিবী এবং পৃথিবী বহির্ভূত জগতের জীব কিংবা লাইফ বিল্ডিং ব্লকসের সন্ধান করতে করতেই হয়তো আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাবো,

"এই ব্রহ্মাণ্ডে কি আমরা কি একা?"

সমুদ্রের গল্প

মো. অমিত হাসান

মহাসাগরগুলি পৃথিবীর পৃষ্ঠের ৭০ শতাংশেরও বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে। পৃথিবীর তলদেশের অনেকাংশ সমুদ্রের দ্বারা আচ্ছাদিত, এটি স্পষ্ট যে এই সামুদ্রিক পরিবেশগুলি গ্রহের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এখনও কতটা অনুসন্ধান করতে হবে। পৃথিবীর বেশিরভাগ জীবই জলজ। পৃথিবীর উপরিভাগের যে পরিমাণ তল তলদেশে রয়েছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সামুদ্রিক প্রজাতিগুলি ভূমির তুলনায় অনেক বেশি। তবে, এটি পৃথিবীর জীবিত প্রজাতির একটি অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থাৎ ৯৪ শতাংশ যা মহাসাগরগুলির মধ্যে বিদ্যমান।

সাগর ও সমুদ্রের পার্থক্য

আমাদের অনেকেরই ধারণা যে সাগর (Ocean) ও সমুদ্র (Sea) একই বিষয়। কিন্তু এ ধারণাটি ভুল।

একটি সাগর এবং একটি সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভূগোলের দিক থেকে, সমুদ্রগুলি সাগরের চেয়ে ছোট এবং সাধারণত যেখানে স্থল এবং সাগর মিলিত হয় সেখানে অবস্থিত। সাধারণত সমুদ্রগুলি আংশিকভাবে জমি দ্বারা বদ্ধ থাকে।

চিত্র: সাগর (Ocean) ও সমুদ্র (Sea)'র মধ্যে পার্থক্য

Seven Seas বা সাত সমুদ্র

Seven Seas বা সাত সমুদ্র একটি ঐতিহাসিক শব্দ যা প্রভাবশালী বাণিজ্য রুট এবং আঞ্চলিক জলের সাথে মিল রেখে নামকরণ করা। সেই সাতটি সমুদ্র এর সংজ্ঞা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। এই শব্দটি প্রথম সুমেরিয়ান এহেদুয়ানানার ৮ ম খ্রিস্টপূর্ব ২,৩০০ খ্রিস্টাব্দে দেবী ইনান্না (মায়াদোর, 2001) এর কাছে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

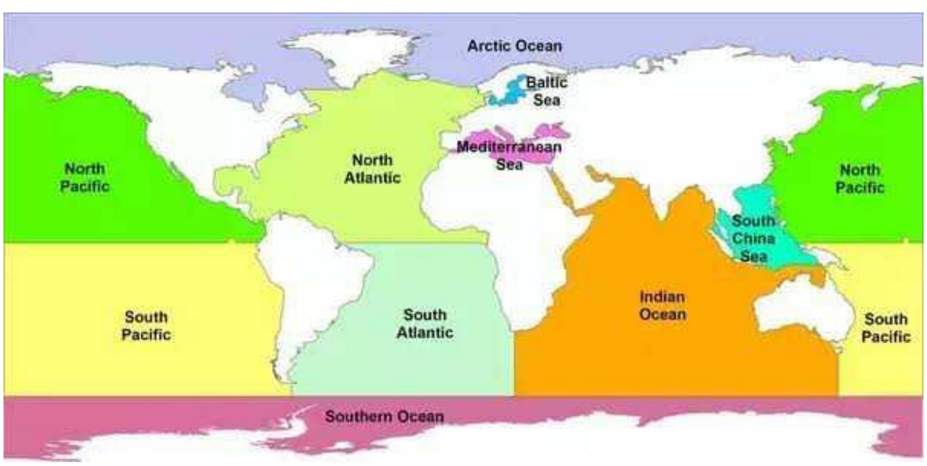

চিত্র: সাত সমুদ্র

প্রাচীন গ্রীকরা এই সাত সমুদ্রকে (এজিয়ান, অ্যাড্রিয়াটিক, ভূমধ্যসাগর, কালো, লাল এবং ক্যাস্পিয়ান সমুদ্র এবং পারস্য উপসাগর) হিসাবে নামকরণ করেছিল। যদিও এখন এটি আর একটি সাধারণ বাক্যাংশ নেই, আধুনিক সাতটি সমুদ্র হ'ল আর্কটিক, উত্তর আটলান্টিক, দক্ষিণ আটলান্টিক, উত্তর পশান্ত, দক্ষিণ প্রশান্ত, ভারতীয় এবং দক্ষিণ মহাসাগর।

সমুদ্র নীল

পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর একভাগ স্থল। জলের আধার সমুদ্রের পানি নীল বর্ণের দেখায়। সমুদ্রের পানি কি তাহলে নীল রঙ ধারণ করে? সমুদ্রের পানি আসলে কোনো বর্ণ ধারণ করে না। তবে এর নীল বর্ণের কারণ

আলোক বিজ্ঞান (Optics) দিয়ে ব্যখ্যা করা যায়।

সূর্যের আলো বর্ণহীন। যা হল বেগুনি, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা,লাল এই সাতটি রং এর সমষ্টি । সূর্যের আলো মেঘের বাধা অতিক্রম করে যখন সমুদ্রে এসে পরে তখন তা এই সাতটি রং এ বিভক্ত হয়ে যায়।

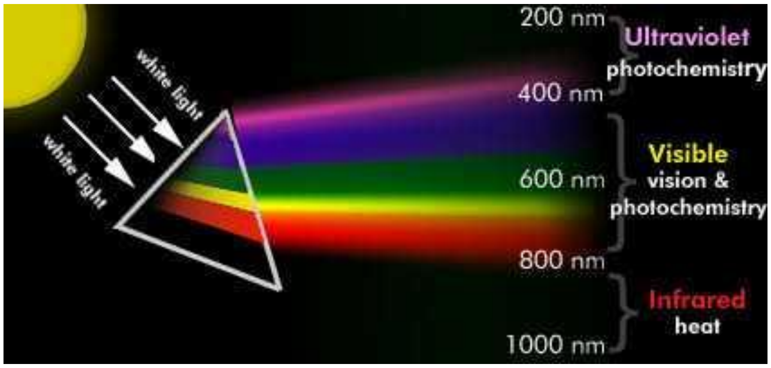

চিত্র: সূর্যের বর্ণালী

আমরা জানি লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ সবচেয়ে বেশি ও বেগুনি বা নীল আলোর সবচেয়ে বেশি। আলোক বিজ্ঞানের সুত্রানুসারে আলোর বিক্ষেপন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘের চতুর্থঘাতের ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ পরিষ্কার পানির ধর্মই হচ্ছে বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করবে এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করবে। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র। তাই বেগুনির পরে নীল আলোর বিক্ষেপন সবচেয়ে বেশি। ফলে সমুদ্র অন্যান্য আলোকে শোষণ করে ও নীল আলোকে প্রতিফলিত করে, যার কারণে সমুদ্রের পানি নীল মনে হয়।

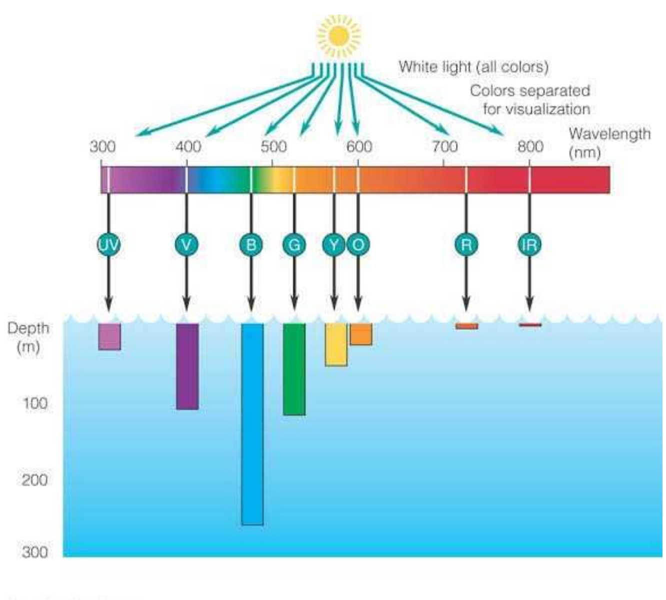

চিত্র: সমুদ্রে নীল আলোর বিক্ষেপন

সমুদ্রের পানি লবনাক্ত

মহাসাগরগুলি নোনতাযুক্ত, যা পান করার পক্ষে অনুপযুক্ত। নুনের বেশিরভাগ অংশ পাথর এবং মাটির খনিজগুলি থেকে আসে যা জমি থেকে ধুয়ে নদীর তীরে সমুদ্রগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। খনিজগুলি বেশিরভাগ ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম যা লবণ তৈরির জন্য ব্যবহার হয়। আমাদের খাদ্য লবণের বেশিরভাগ অংশ সমুদ্র থেকে আসে। লবণাক্ততা, লবণের পরিমাণ সমুদ্রের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হয়। উষ্ণ, শুষ্ক অঞ্চলে সমুদ্রগুলি উত্তর ও দক্ষিণ মেরুগুলির নিকটে অর্থাৎ শীতল আবহাওয়ার সমুদ্রের চেয়ে বেশি লবণাক্ত। এর কারণ হ'ল উষ্ণ অঞ্চলে সমুদ্রের জল দ্রুত বাষ্পীভবন করে, আরও বেশি নুন জমা হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লবণাক্ত জল রয়েছে লোহিত সাগরে, যা প্রায় পুরোপুরি মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত।

সমুদের জোয়ার

জোয়ার তরঙ্গ এবং স্রোত সমুদ্রকে অবিচ্ছিন্নভাবে চলাচলের কারণ করে। একটি জোয়ার হল সমুদ্র এবং অন্যান্য জলের জলে সমুদ্রপৃষ্ঠের নিয়মিত উত্থান ও পতন'। এটি পৃথিবীতে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবের কারণে ঘটে। পৃথিবীর পাশের জল যা চাঁদের নিকটে রয়েছে চন্দ্রের দিকে টানা হয় এবং সমুদ্রের মধ্যে একটি স্ফীতাংশ তৈরি করে। পৃথিবীর অপর প্রান্তে, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীটিকে জল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যা মিলে যায় স্ফীতাংশ তৈরি করে। এই স্ফীতাংশগুলি উচ্চ জোয়ার গঠন করে। যেহেতু পৃথিবীটি তার অক্ষরেখা ঘোরায়, পৃথিবীর প্রতিটি পয়েন্ট (খুঁটি ব্যতীত) দুটি উচ্চ জোয়ার অঞ্চল এবং দুটি নিম্ন জোয়ার অঞ্চল দিয়ে প্রতিদিন ভ্রমণ করে। এই কারণেই প্রতিদিন দুটি বড় জোয়ার এবং দুটি ছোট জোয়ার হয় বসন্তকালের জোয়ার, যা বিশেষত শক্তিশালী, নতুন এবং পূর্ণ চাঁদের সময় ঘটে থাকে প্রতি দুই সপ্তাহে, যখন পৃথিবী, চাঁদ এবং সূর্য সারিবদ্ধ থাকে।

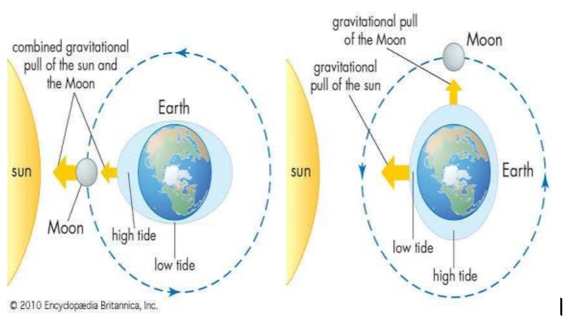

।

চিত্র: সামুদ্রিক জোয়ার

চিত্র: সামুদ্রিক জোয়ারের বৈজ্ঞানিক তথ্য

স্নিগ্ধ জোয়ার, যা দুর্বল, প্রথম এবং শেষ প্রান্তিকের চাঁদের সময় ঘটে যখন সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ একটি সমকোণ গঠন করে।

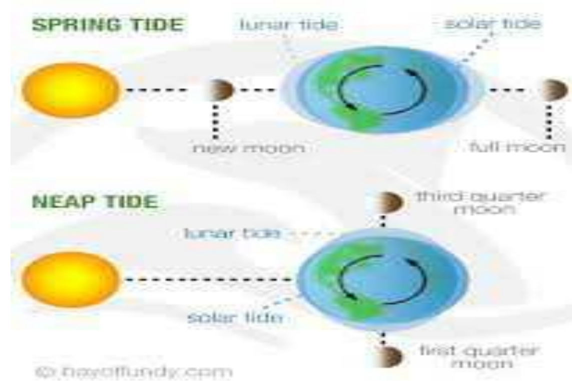

চিত্র: সামুদ্রিক জোয়ারের প্রকার

সামুদ্রিক তরঙ্গ

বাতাস সমুদ্রের ঢেউ বা তরঙ্গসৃষ্টি করে। সমুদ্রের উপরিভাগের উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এটি পানির দিকে ধাক্কা দেয় এবং এর কিছু শক্তি জলে স্থানান্তর করে। বায়ু অণু এবং জলের অণুর মধ্যে ঘর্ষণ কারণ জল জল বাতাস থেকে শক্তি পায়। দেখে মনে হতে পারে তরঙ্গগুলি সামনে বা অনুভূমিকভাবে অগ্রসর হয়তবে , তারা তা করে না। তারা উপরে এবং নীচে সরানো। এটি পাশ থেকে একপাশে যাওয়ার চেয়ে তরঙ্গগুলি দিয়ে উপরে এবং নীচে ডুবে যায়।

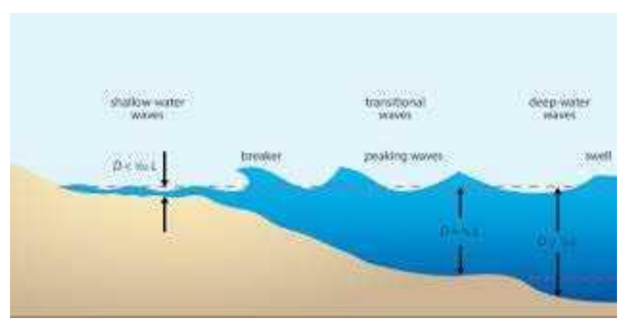

চিত্র: সামুদ্রিক তরঙ্গ

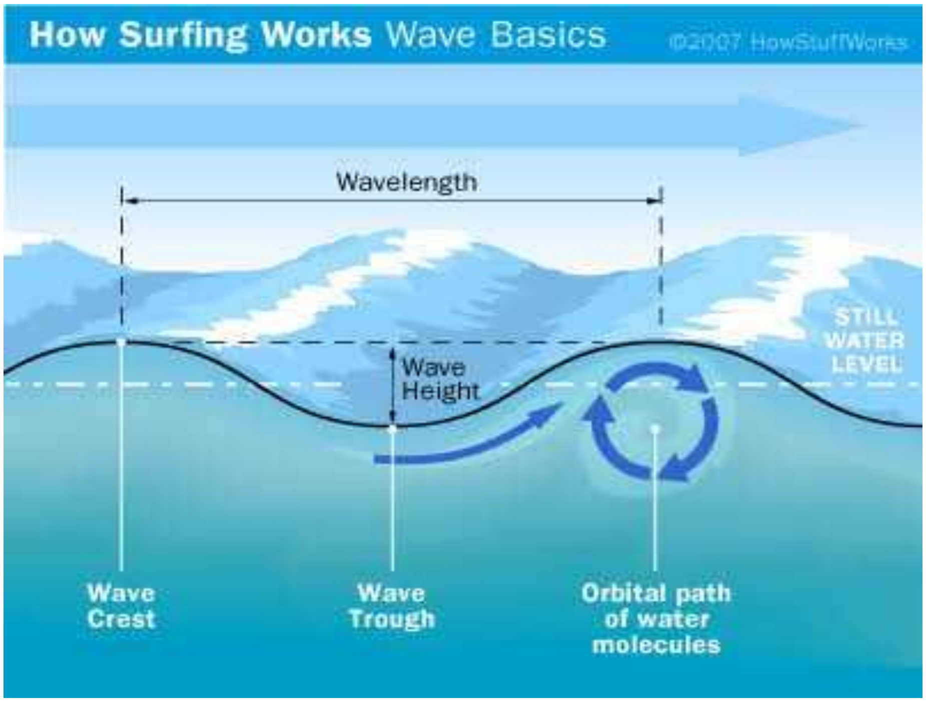

চিত্র: সামুদ্রিক তরঙ্গের অবস্থান

বিশ্বের দীর্ঘতম পর্বতশৃঙ্গটি পানির নীচে। পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতগুলির শৃঙ্খলা, মধ্য-ওশান রিজ প্রায় পুরোপুরি সমুদ্রের নীচে ৬৫,০০০ কিলোমিটার দূরত্বে বিস্তৃত। বলা হয় যে এই পর্বত শৃঙ্খলাটি শুক্র বা মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠের চেয়ে কম অনুসন্ধান করা হয়েছে। একটি বিস্ময়কর তথ্য হলো আমাদের গ্রহের অক্সিজেন এর ৭০ শতাংশের বেশি অক্সিজেন সমুদ্র দ্বারা উৎপাদিত হয়।

মনে করা হয় যে আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশের মতো অক্সিজেন সামুদ্রিক গাছপালা, শেওলা ইত্যাদি দ্বারা উৎপাদিত হয়। সমুদ্র যেমন বিশাল তার বিস্ময়ও তেমন বিশাল এবং বৈচিত্র্যময়। দিন দিন সমুদ্র নিয়ে গবেষণা বেড়েই চলেছে। গ্রহের সমুদ্রের পাঁচ শতাংশেরও কম অংশ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মহাসাগর পরিষেবা অনুসারে, মানুষ পৃথিবীর পাঁচ শতাংশেরও কম মহাসাগর অনুসন্ধান করেছে। সমুদ্র বিষয়ক গবেষক বা সমুদ্রবিজ্ঞানীরা আরও আবিষ্কার করার চেষ্টা করার সাথে সাথে আমরা ক্রমাগত আমাদের মহাসাগরগুলি আরও ভালভাবে জানতে পারছি। সমুদ্র বিষয়ে গবেষণা ও তার ধন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হতে পারে পরবর্তী আধুনিক বিশ্বের অন্যতম হাতিয়ার।

চিত্র: সমুদ্রবিজ্ঞানী

আমাদের উচিত সমুদ্রের প্রতি ভালোবাসা জন্মানো ও সমুদ্র বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা। কারণ সমুদ্রের পানির পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে, পৃথিবীও আস্তে আস্তে ডুবছে। হয়ত ভবিষ্যতে বাঁচতে হবে সমুদ্রেই।

বিজ্ঞানাঙ্গনে লেখা দিতে আগ্রহী? লেখা জমা দিতে মেইলে যোগাযোগ করুন editor@bigganangon.shikkhaweb.com এই ইমেইলে। অথবা মেসেজের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন আমাদের ফেসবুক পেইজে: https://www.facebook.com/ShikkhaWebSC

বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট সমস্যা ও সমাধান

সাবিকুন আরা হিমাদ্রী

বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্টটি মনোবিজ্ঞানের জগতে বিস্মিত একটি ধারণা। তবে বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট কী এবং কেন হয় এটি জানার জন্য প্রথমে আমাদের ২৬ জুন, ২০১৯ সালের একটি ঘটনার দিকে ফিরে তাকাতে হবে, যেখানে ৭৭ জন সাক্ষীর সামনে একজন ব্যক্তিকে বারবার নির্মমভাবে ছুরিকাঘাত করা হয় এবং কেউই সাহায্য করেনি।

এই ঘটনার পরে সাক্ষীদের সম্পর্কে অনেক মতামত দেয়া হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে কেন সাক্ষীর কেউই পুলিশকে ফোন করতে বা সহায়তা করার চেষ্টা করেনি সে সম্পর্কে কারণও দেখানো হয় এই ঘটনাটি আরেকটি কুখ্যাত হত্যার সাথে মিল, যা পরবর্তীতে এই ধারণাটি (বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্টের) জন্ম দেয়।

১৯৬৪ সালে নিউ ইয়র্কের কুইন্সে, কিটি জেনোভেজ নামে এক মহিলা ৩৮ জন সাক্ষীর সামনে মারা গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। তবে, তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছেছেন। কিন্তু তার হত্যাকারী ১০ মিনিটের পরে তাকে খুঁজে পেয়েছিল, তাকে আবার ছুরিকাঘাত করেছিল, ধর্ষণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করেছিল।

সেই সময়ে, যদি কেউ তাকে সহায়তা করত তবে তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন। আরও ভাল না হলে রিফাত হত্যার পরিস্থিতি একই ছিল। তবে কেন কেউ সাহায্য করেনি? এটি কি কারণ আমাদের মানবিকতার চেতনা মরে যাচ্ছে?

কিটি জেনোভেজ মারা যাওয়ার পরে, একই প্রশ্ন উঠে আসে। তবে এখানে এই ধারণাটির দিকে আলোকপাত করা হয় যে আপনি যদি আরও বেশি লোকের মধ্যে থাকেন তবে সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা কম হবে। ভিড় যত বেশি হবে তত কম লোকেরা আপনাকে সমস্যায় সাহায্য করবে। এবং এই ধারণাটি দিয়েছেন দুজন সামাজিক মনোবিজ্ঞানী ডারলি এবং ল্যাটেন।

ডারলি এবং ল্যাটেন বাইস্ট্যান্ডার এফেক্টের কারণটিকে দায়িত্বের বিস্তার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মানুষ সামাজিক প্রাণী, তারা দলে দলে থাকে। যখন কোনও গোষ্ঠী কিছু করতে ব্যর্থ হয়, তখন কেউই দোষ বহন করে না। কারণ অপরাধবোধ তাদের সবার মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়।

এটি ডারলি আর ল্যাটেনের একটি পরীক্ষায় উঠে এসেছে।যে পরীক্ষাটিতে তারা কিছু স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তাদের বিভিন্ন সংখ্যক লোকের মধ্যে রেখে দল গঠন করে। এবং তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে এমন আচরণ করতে বলা হয় যাতে মনে হয় তাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়ার সময়ও বেড়ে যাচ্ছিল। ৫/৬ জন লোকের উপস্থিতিতে, স্বেচ্ছাসেবীরা সাহায্য করার জন্য প্রায় ৩ মিনিট বাড়তি সময় নিয়েছিল অথচ বড়সড় হার্ট অ্যাটাকের ফলে একজন ব্যক্তি ১০ মিনিটের মধ্যে মারা যেতে পারে।

A phenomenon in which bystanders do not help a victim when other people are present. The more people are present, the less likely anyone is to offer assistance.

সেই গবেষণার আলোকে মনে হয় বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্টটি কেবল নেতিবাচক হতে পারে।

বিশেষত, আজকাল সর্বত্র যেহেতু সর্বদা বৃহত সংখ্যক ভিড় খুঁজে পাওয়া সহজ। তাহলে আমরা যখন ভিড়ের মধ্যে থাকি তখন কি আমরা সম্ভাব্য বিপদে পড়তে পারি? কিন্তু এটি এত সহজ ব্যাখ্যা নয়।

তাহলে কীভাবে আমরা বাইস্ট্যান্ডার এফেক্টের নেতিবাচক দিকগুলি থেকে নিজেদের রক্ষা করব? একটি উপায় হলো, আমরা বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্টটিকে সহায়ক সাহায্যে পরিণত করতে পারি। সাহায্যকারী প্রভাব হ'ল লোকেরা যখন কোনও ভুক্তভোগীর পক্ষে প্রতিবাদে কথা বলে এবং অপরাধীকে ধরতে সহায়তা করে। এর মতো একটি বাস্তব ঘটনাটি ঘটেছিল যখন ৪ জন স্কেটবোর্ডার কিশোর একজন লোককে অন্য মেয়েকে উক্ত্যক্ত করা থেকে বিরত করে এবং তাকে ধরতে সহায়তা করে।

যদি সত্যিই এটি ঘটতে পারে তবে আমরা কীভাবে এটি করব? উত্তরটি কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করার মাধ্যমে সহায়তা চেয়ে। এটি করে আমরা প্যাসিভ বাইস্ট্যান্ডারদের সক্রিয় বাইস্ট্যান্ডারে রূপান্তর করি। এইভাবে বাকিরাও নেতৃত্ব অনুসরণ করতে এবং অন্যকে সহায়তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

যখন আমরা এটি করি, সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আগের চেয়ে বেশি হয়ে যায় এবং বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্টটি কেবল বাতিল করে দেয় না বরং আরও বড় কিছুতে পরিবর্তিত হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে এটি জীবনযাত্রায় বির্বতন নিয়ে আসে।

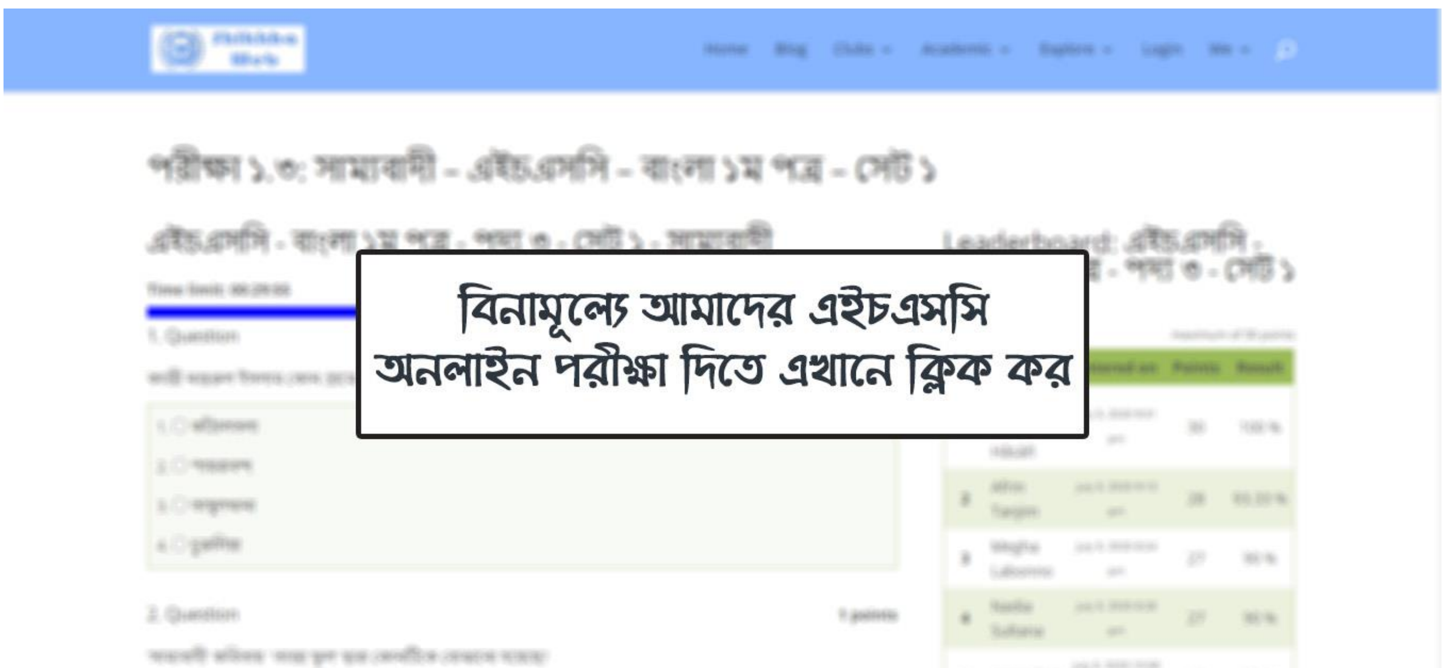

এখানে ক্লিক করে করোনাকালীন সময়ে ঘরে বসে অনলাইনে এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে যোগ দাও আমাদের অনলাইন পরীক্ষায়। এটি সবসময়ের জন্যই সম্পূর্ণ বিনামূল্য!

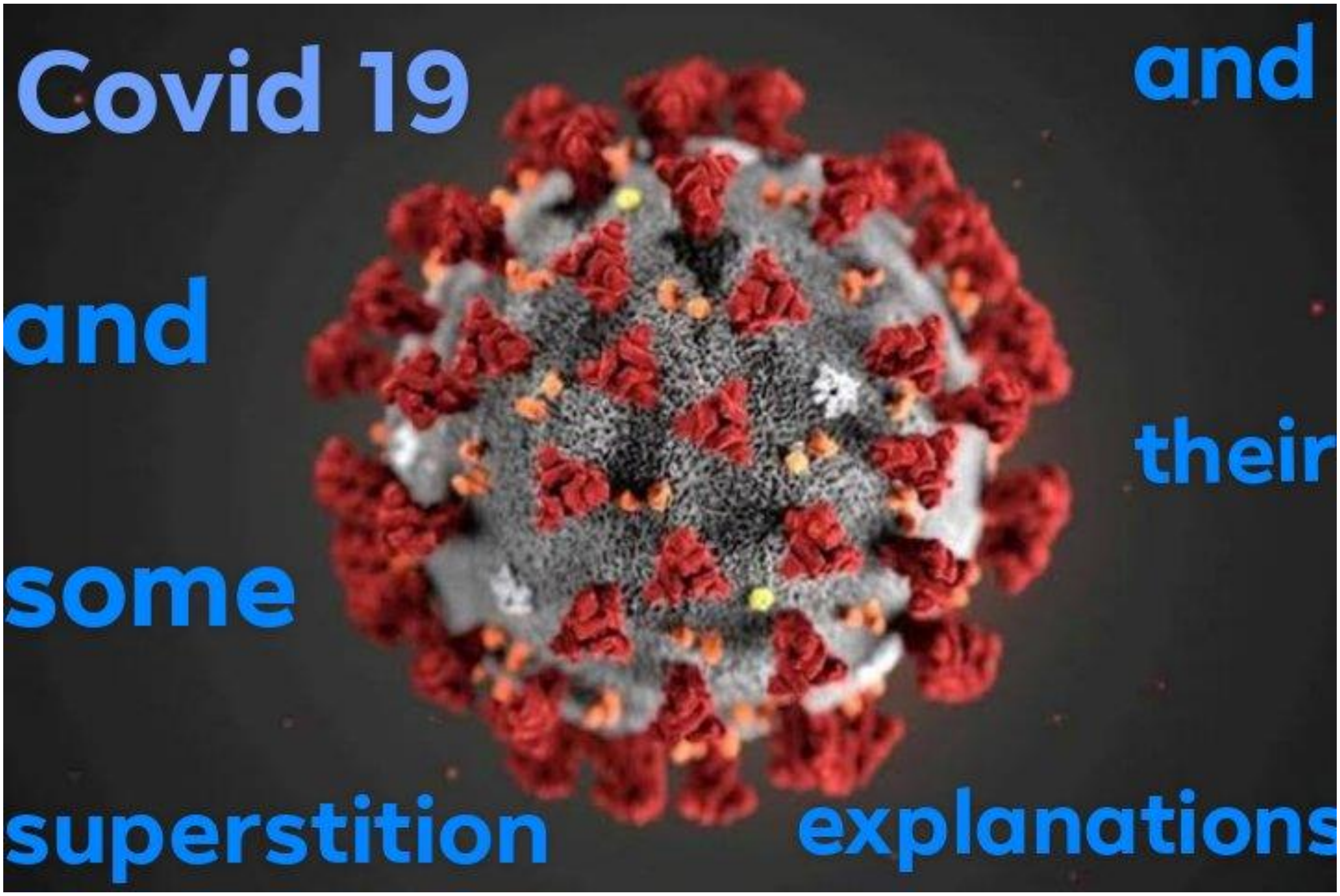

কোভিড-১৯ এবং কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও সেসবের ব্যাখ্যা

ফারহান কবির

বর্তমান বিশ্বে মহামারী আকার ধারণ করা এক রোগের নাম করোনাভাইরাস ২০১৯ (কোভিড-১৯) যা সদ্য আবিষ্কৃত করোনা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট। এর কারণে এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রায় ৩ লক্ষেরও অধিক লোক মারা গেছেন। এখন পর্যন্ত ১৮৮ টির ও বেশি দেশে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। যেহেতু এর কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা এখন ও আবিষ্কার হয় নি, তাই প্রতিরোধই করোনা মোকাবেলার ভালো উপায়।

মানুষের মধ্যে কোভিড-১৯ নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বা কুসংস্কার আছে। চলুন জেনে নেয়া যাক এমন কিছু কুসংস্কার আর এসবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

কোভিড-১৯ মানব সৃষ্ট ভাইরাস

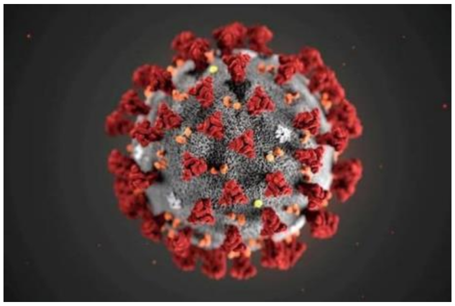

সামাজিক গণমাধ্যমে সাম্প্রতিক কালে একটা খবর ছড়িয়েছে। তা হলো কোভিড-১৯ একটি মানব সৃষ্ট ভাইরাস। চীনের উহানে প্রথম ধরা পরা এ ভাইরাসটির উহানের কোনো একটা ল্যাবোরেটরিসে তৈরি কৃত বলে খবর সামাজিক গণমাধ্যমে পাওয়া যায়। যদিও সাম্প্রতিকালের গবেষণা হতে জানা যায় যে কোভিড-১৯ একটি প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট ভাইরাস। নেচার মেডিসিন এ প্রকাশিত অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করে যে কোভিড-১৯ প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফল।

করোনাভাইরাস পানির মাধ্যমে ছড়ায়

যদিও পানির মধে করোনাভাইরাসের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, কিন্তু এখন ও এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে করোনাভাইরাস ভুগর্ভস্থ জলের উৎসে উপস্থিত রয়েছে। করোনাভাইরাস পৃষ্ঠতলে ঠিক কতক্ষন বেঁচে থাকে ত এখন ও অজানা। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায়, তারা পৃষ্ঠতলে ২ ঘন্টা থেকে ৯ দিন পর্যন্ত ও বাঁচতে পারে। যদিও পানিও জলে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাস এর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবুও আমাদের পানি ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে পান করা উচিত।

করোনাভাইরাসে শুধু বয়স্করাই আক্রান্ত হয়

এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। যেকোনো বয়সের ব্যক্তি ই করোনাভাইরসে আক্রান্ত হতে পারে। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত আক্রান্ত দের মধ্যে বড় একটা অংশ তরুণরা। যারা বয়স্ক এবং আগে থেকে অসুস্থতা থাকলে এমন ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে গুরুতর অসুস্থ হবার ঝুঁকি থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সব মানুষকে ভাইরাস থেকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

অ্যান্টিবায়োটিকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ হয়

অ্যান্টিবায়োটিক ভাইরাস এর বিরুদ্ধে নয়, ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী। নভেল করোনা ভাইরাস এক ধরনের ভাইরাস বিধায় এর চিকিৎসা বা প্রতিরোধে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে কেউ যদি নভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, তিনি ব্যাকটেরিয়া থেকে সহ-সংক্রমণের ওষুধ পেতে পারেন।

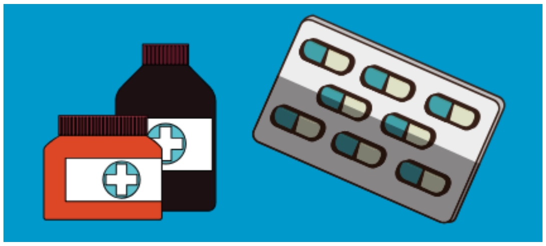

রিমেদেসিভ ব্যবহারে করোনা প্রতিরোধ হয়

এটা ভুল ধারণা। এখন পর্যন্ত নভেল করোনা ভাইরাস এর চিকিৎসা বা প্রতিরোধে কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কার হয় নি। যুক্তরাষ্ট্রে রিমেদেশিভ ওষুধ ব্যবহারে ভালো ফল পাবার পর সারা বিশ্বে এটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এটাকে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ মনে করা হয়। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৩১ তারিখ আয়োজিত সভায় এটি সহ অ্যান্টিভাইরালগুলি ব্যবহারের বিরুদ্ধে সুপারিশ করেছে।

চীন থেকে আসা পার্সেল গ্রহণ করা নিরাপদ নয়

এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা যায় মানব দেহের বাইরে এই ভাইরাস বেশি দিন বাঁচে না। তাই চীন থেকে আসা কোনো পার্সেল যদি কেউ গ্রহণ করেন তবে তিনি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়বেন না।

হ্যান্ড ড্রায়ার করোনা ভাইরাস ধ্বংসে কার্যকরী

এটি একটি ভুল ধারণা। হ্যান্ড ড্রায়ার নতুন করোনা ভাইরাসকে ধ্বংসে কার্যকরী নয়। নিজের সুরক্ষার জন্য দুই হাত বারে বারে সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

তিলের তেল মাখলে শরীরে করোনা ভাইরাস প্রবেশ করবে না

তিলের তেল করোনা ভাইরাসকে ধ্বংস করতে পারে না। কিছু রাসায়নিক জীবাণুনাশক যেমন- ব্লিচ/ক্লোরিন ভিত্তিক জীবাণুনাশক, ইথার দ্রবণ, ৭৫% ইথানল, প্যারাসেটিক এসিড, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি কোনো বস্তুর উপরিভাগ থেকে করোনা ভাইরাসকে মেরে ফেলতে সক্ষম।

আল্ট্রা ভায়োলেট জীবাণুনাশক ল্যাম্প করোনা ভাইরাস ধ্বংস করতে পারে

হাত বা শরীরের অন্য কোনো অংশ জীবাণুমুক্ত করার জন্য আল্ট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প ব্যবহার করা উচিত নয়। আল্ট্রা ভায়োলেট ল্যাম্পের ব্যবহারে ত্বকে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

মশার কামড়ে করোনা ছড়ায়

মশার কামড়ে করোনা ছড়ায় এমন কোনো তথ্য বা প্রমাণ এখন ও পাওয়া যায় নি। নভেল করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর হাঁচি, কাশি, কফ , থুথু ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায়।

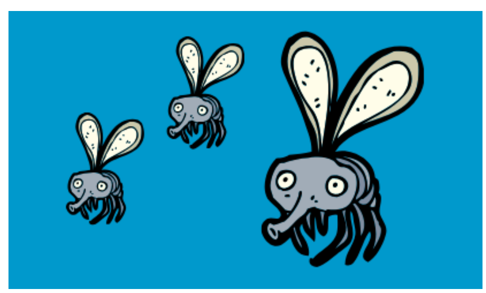

তেলাপিয়া মাছ খেলে করোনা হয়

এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে তেলাপিয়া মাছ খেলে ক্যান্সার এর ঝুঁকি ১০% বেড়ে যায়। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়া থেকে আমদানকৃত মাছ থেকে গবেষণা করে জানা গেছে,

"তেলাপিয়া মাছে ডিবিউটিলিন ও ডাইঅক্সিন এর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর।"

তবে বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) এর পক্ষ থেকে

জানানো হয়েছে যে,

বাংলাদেশে উৎপাদিত তেলাপিয়া মাছে এরকম স্বাস্থ্যগত সমস্যা বা ঝুঁকি নেই।

কিছু প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর:

গরম পানির ব্যবহার কি করোনা প্রতিরোধ করতে পারে?

না, গরম পানির ব্যবহার করোনা প্রতিরোধ করতে পারে না। গোসলে গরম পানি ব্যবহার করা হলেও মানব দেহের তাপমাত্রা ৩৬.৫° ও ৩৭° র কাছাকাছিই থাকে। তবে গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করা যেতে পারে।

নতুন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্তকরণে থার্মাল স্কান কতটুকু যৌক্তিক

থার্মাল স্কান গুলি এমন ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে কার্যকর যাদের জ্বর রয়েছে (শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক এর চেয়ে বেশি থাকে)। কিন্তু এগুলি দিয়ে করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করতে পারে না।

কোভিড-১৯ মূলত ছড়িয়ে পড়ে যখন লোকেরা ঘনিষ্ট যোগাযোগে থাকে এবং একজন ব্যক্তি সংক্রমিত ব্যক্তির দ্বারা উৎপাদিত ছোটো ছোটো (লক্ষণগত বা না) কাশি, হাঁচি, কথা বলা বা গান গাওয়া শ্বাস দেয়। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে লক্ষণ প্রকাশ হতে ও পারে, নাও হতে পারে। তাই আমাদের উচিত সামাজিক দুরত্ব মেনে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা।

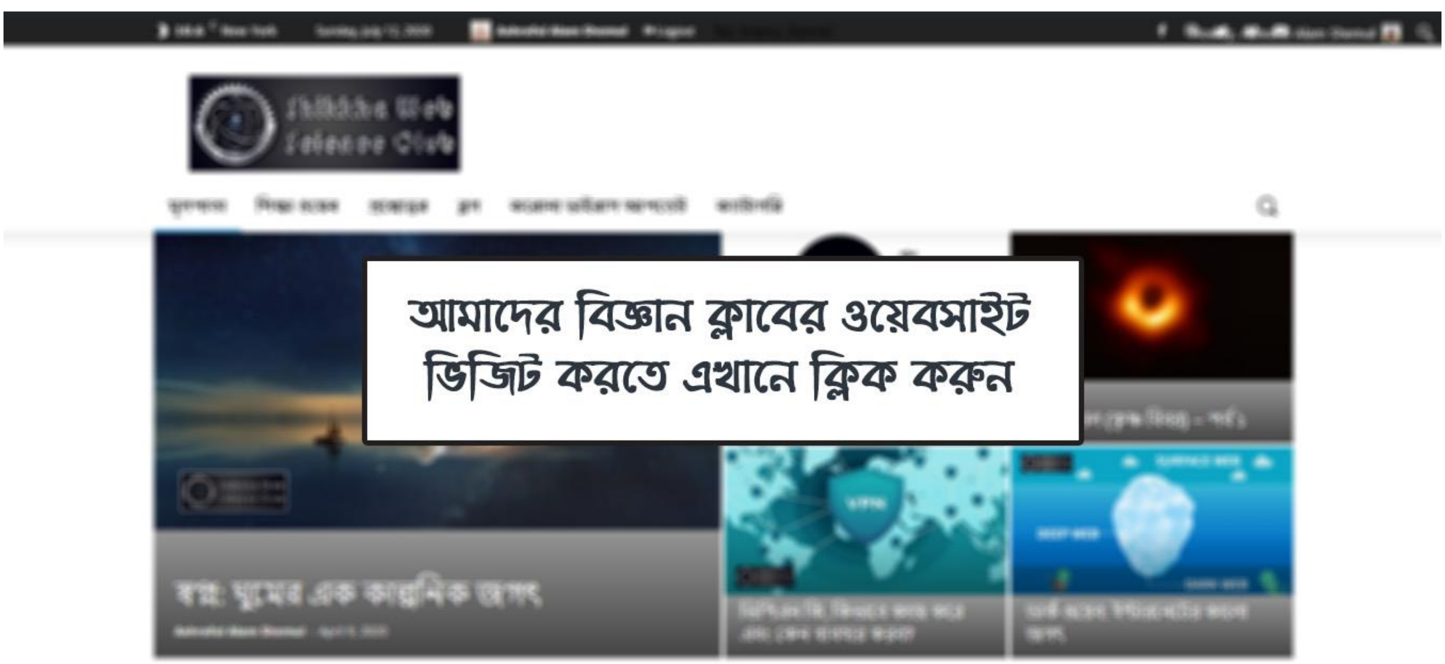

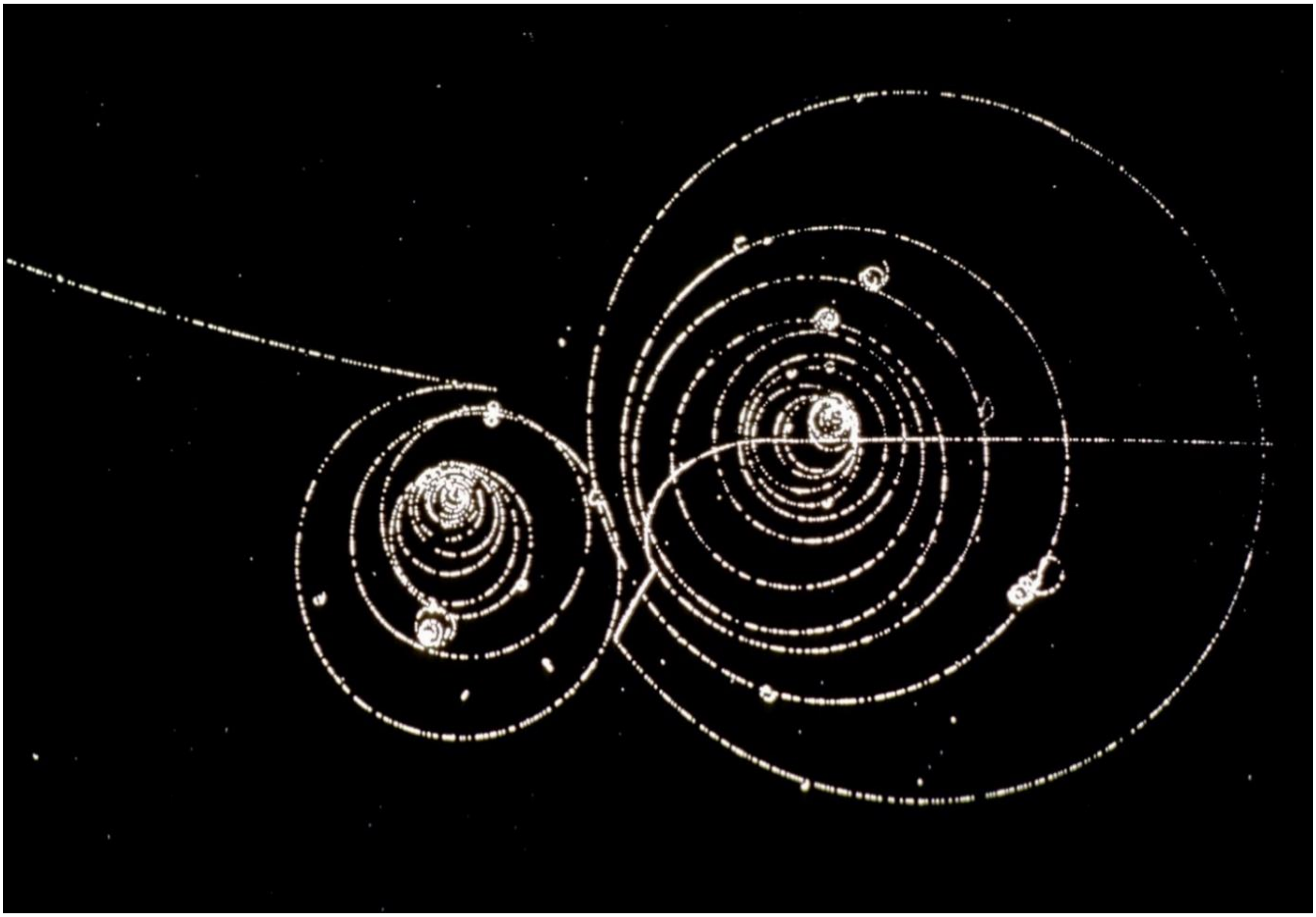

অ্যান্টি ম্যাটার

ইফতেখার আহমেদ

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে অ্যান্টি ম্যাটার খুবই জনপ্রিয়, চিত্তাকর্ষক এবং রহস্যময় একটি বিষয় যার জন্ম হয়েছে সমান ভর যুক্ত বিপরীত আধান প্রকৃতির কণার ধারণা থেকে। ১৯২৮ সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী **পল ডিরাক** এর পজিটিভ ইলেকট্রনের অস্তিত্বের ধারণা থেকে যাত্রা শুরু মানব ইতিহাসের সবচেয়ে দামী পদার্থ **'প্রতিপদার্থ'** এর খোঁজ।

প্রতিপদার্থ বা অ্যান্টি ম্যাটার (Anti Matter) সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানতে হবে পদার্থের (Matter) ব্যাপারে।

পদার্থ হল এমন সব কিছু যা ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে তৈরি ফলে যার ভর থাকে এবং যা জায়গা দখল করে। অ্যান্টি ম্যাটার মূলত্য পজিট্রন, অ্যান্টি প্রোটন দিয়ে তৈরি যাদের ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমান কিন্তু চার্জ সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ যেখানে পদার্থে ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জধারী সেখানে অ্যান্টি ম্যাটারে ইলেকট্রন সমান ভূমিকা পালন কারী সমান ভরের কণা পজিট্রনের চার্জ পজিটিভ।

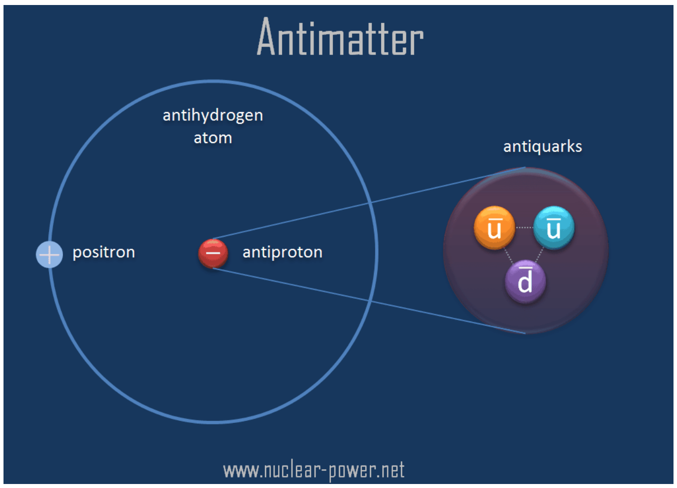

আপাত দৃষ্টিতে অ্যান্টিম্যাটার পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল সূত্র থেকে অনুপ্রাণিত হওয়া কল্পনা মনে হলেও এটি একটি পরীক্ষিত বাস্তবতা। কিন্তু প্রথমে এটি শুধু একটি খেয়ালি ধারনাই ছিলও যা বিজ্ঞানী পল ডিরাক (Paul Dirac) এর মাথায় আসে বিজ্ঞানী শ্রোডিঙ্গারের Schrödinger wave equation এর থেকে। তিনি ধারনা করেছিলেন যে ইলেকট্রনের বিপরীত অ্যান্টি ইলেকট্রন এর অস্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যা পরবর্তীতে বিজ্ঞানী Carl D. Anderson আবিস্কার করেন এবং এর নাম রাখা হয় পজিট্রন।

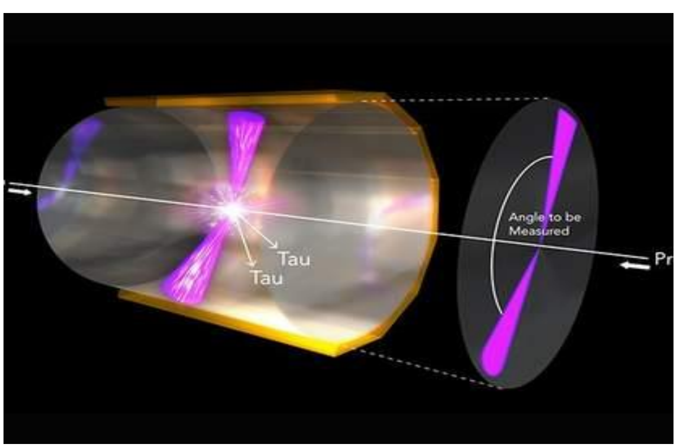

প্রথম অ্যান্টি ম্যাটার যা Particle Accelerator এ ধরা পরে তার নাম হল অ্যান্টি হাইড্রোজেন যার খোজ মেলে ১৯৯০ সালে।

আর ২০১০ সালে আলফা (ALPHA – Antihydrogen Laser Physics Apparatus) অ্যান্টি হাইড্রোজেন কে আটকাতে সফল হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে Primary Cosmic Rays এর মধ্যে কিছু পরিমান পজিট্রন এবং অ্যান্টি প্রোটন রয়েছে। তাছাড়ও পৃথিবীর ভেন আলেন বেল্ট (Van Allen Belts Zone) জোনে প্রায় ১৬০ ন্যানো গ্রাম অ্যান্টি ম্যাটার রয়েছে। যা থেকে 8 kW-h শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব।

মহাবিশ্বে সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় পাওয়া যায়। এই কথা সাধারণ ম্যাটার এবং অ্যান্টি ম্যাটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহা সম্প্রসারণের সময়ে সম পরিমানের সাধারণ ম্যাটার এবং অ্যান্টি ম্যাটার তৈরি হয়ে ছিল। এখন প্রশ্ন হলো ঐ অ্যান্টি ম্যাটার গুলো এখন কোথায়?

অনেকে মনে করেন এই সব অ্যান্টি ম্যাটার দিয়ে তৈরি হয়েছে অ্যান্টি ম্যাটার মহাবিশ্ব।

অ্যান্টিম্যাটার মহাবিশ্বে সময় কীভাবে যায় সেটা নিয়ে অনেকের দ্বিধা রয়েছে। কেও কেও ধারণা করেন এই জগতে সময় উল্টো ভাবে চলে। আবার অনেক বলে এই জগত আর আমাদের জগতের সময় একই ভাবে চলে।

তবে এই অ্যান্টি ম্যাটারের জগতের এই অনুকল্প কে সম্পূণ ভুল বলা যায় কারণ অ্যান্টি ম্যাটার এর তৈরি মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্র তৈরি হবে না শুধু থাকবে অ্যান্টি হিলিয়াম আর অ্যান্টি হাইড্রোজেন।

অ্যান্টি ম্যাটার কিন্তু খুবই মূল্যবান! ১৯৯৯ NASA এক প্রতিবেদন বের করে যার মতে ১ গ্রাম অ্যান্টি হাইড্রোজেন এর মূল্য প্রায় ৬২.৫ ট্রিলিয়ান ডলার ($62.5 trillion)। বলাই বাহুল্য যে এইটি সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুর মধ্যে একটি।

এখন প্রশ্ন হল কেন আমরা এতো টাকা খরচ করব এই অ্যান্টি ম্যাটারের পেছনে? এতে কি কোন কল্যান রয়েছে

মানবসভ্যতার জন্যে? এর উত্তর হল "হ্যাঁ" অ্যান্টিম্যাটার সমাধান করতে পারে আমাদের অনেক বড় একটি সমস্যা। সেটা হলো 'শক্তি'।

ম্যাটার এবং এন্টিম্যাটারের সংস্পর্শে তৈরী হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি। ভবিষ্যতে যার দ্বারা খুব শক্তিশালী জ্বালানি তৈরি করে ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে তাছাড়াও বর্তমানে চিকিৎসা ক্ষেত্রে PET (Positron Emission Tomography) পজিট্রন ব্যবহার করা হয়। যা যেকোনও ইমাজিং থেকে নিখুঁত ভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারে। এই থেকে বুঝা যায় এর আর অনেক ব্যবহার বের হবে যত এর উপর গবেষণা করা হবে।

বিজ্ঞানের যতো আবিষ্কার আছে সব গুলোরই ভালো মন্দ দিক রয়েছে অ্যান্টি ম্যাটারও তার ব্যাতিক্রম না।

এর ভেতরে যে শক্তি রয়েছে তা দিয়ে তৈরি করা যাবে পারমাণবিক বোমার থেকেও শক্তিশালী বোমা!

যা বদলে দিতে পারে আমাদের ভবিষ্যৎ।

তবে এটা নির্ভর করে আমাদের উপর।আমরা আমাদের সভ্যতাকে নিয়ে যেতে চাই কোন রাস্তায়। তবে এখন আপাতত অ্যান্টিম্যাটার আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এটি আসবে সৃষ্টিশীল মানুষের হাতের মুঠোয়। ধ্বংসের ইচ্ছা ছেড়ে হয়ত মানুষ তাকাবে দূর অন্তরীক্ষে অ্যান্টিম্যাটারের বিপুল শক্তিতে ডানা মেনে "মানুষ" কে নিয়ে যাবে গ্যালাক্সি থেকে গ্যালাক্সিতে।

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য হতে চান? তাহলে আজই রেজিস্ট্রেশন করুন এই লিংকে ক্লিক করে। তারপর এখানে ক্লিক করে আমাদের গ্রুপে লেখালেখি করুন এবং https://scienceclub.shikkhaweb.com এ গিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে লেখালেখি করে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চায় যোগ দিন।

কার্নিভোরাসদের জঙ্গলে

দিপাঞ্জন সরকার

প্রকৃতি রহস্যয়ময়ী ক্ষুদ্র মাকড়সা থেকে শুরু করে জর্ডানের ডেড সী সব কিছুই সেই রহস্যের অন্তর্গত। কখনও কখনও এই রহস্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে গভীর মৃত্যু ফাঁদ। কিন্তু মৃত্যু ভয় হার মানে ক্ষুধার কাছে, তাই বাইরে লুকিয়ে থাকা শমনকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে পরতে হয় খাদ্যের সন্ধানে।

আপাত দৃষ্টিতে এই রহস্যময় প্রকৃতিতে সবচেয়ে সরল মনে হয় উদ্ভিদকূলকে। সহজ সরলভাবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন সাতে পাঁচে থাকে না। ক্ষুধা লাগলে শর্করা ভেঙ্গে খেয়ে ফেলে। সেই কাহিনীতে আরেকদিন যাব। আজকে বলব এই শান্ত শিস্ট উদ্ভিদেরই এক বিস্ময়কর প্রজাতীর কথা, যারা শর্করার চেয়ে আমিষে বেশি আসক্ত,

এদের গঠন পদ্ধতি যেমন সুন্দর, শিকার পদ্ধতি তেমনি ধূর্ত এবং ভয়ংকর। উদ্ভিদকূলের এই মাংশাসী প্রজাতিগুলোর একটি সাধারণ নাম আছে

‘Carnivorous Plants’

সারা পৃথিবীতে এই উদ্ভিদকূলের মোট ১০০০ টি প্রজাতি ও উপ প্রজাতি আছে।

এই কার্নিভোরাস উদ্ভিদগুলোর সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হল এদের গঠন এবং শিকার কৌশল কোনটা দেখতে ভালুক ধরার ফাঁদের মতো, আবার কোনটা কলসের মতো; আরেক ধররনের প্রজাতি আছে যারা সাধারণ লতানো উদ্ভিদের মতো দেখতে। মূলত **North America, southeastern Asia এবং Australia** তে এদের বেশি দেখা যায়।

জ্ঞানের কথা অনেক হল। এবার আমাদের এই শিকারী বন্ধুদের সম্বন্ধে কিছু রোমাঞ্চকর জিনিস সম্বন্ধে জানা যাক।

Venus Flytrap *(Dionaea muscipula)*

“ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ” ভেনাস একটি রোমান শব্দ, মূলত এটি রোমানদের ভালোবাসার এবং উর্বরতার দেবীর নাম। “আজব তো!!! একটা গাছের নাম কেন এরকম হতে যাবে!!!” রোসো ভায়া রোসো, সব কিছুই বলব একটু সবুর কর।

ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপএর দেহকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। মাটি থেকে উপরের দিকে উঠে জাওয়া কাণ্ড এবং কাণ্ডের সাথে যুক্ত পাতা যা মূলত ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। দুই পত্রফলক বিশিষ্ট পাতাগুলো দেখতে অনেকটা ভালুক ধরার ফাঁদ বা হিংস্র জন্তুর চোয়ালের মতো। কান্ড উপরের দিকে উঠে চ্যাপ্টা হয়ে পিটিওলে পরিণত হয় যা পরবর্তীতে পাতার সাথে যুক্ত হয়। একটি পাতা দুইটি। পাতা সহ সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সবুজ রং এর হলেও পত্রফলকের ভিতরের দিকে Anthocyanin বিদ্যমান থাকে যার কারণে অভ্যন্তর ভাগ লাল বর্ণের হয়। তাছাড়া এই অভ্যন্তর ভাগ থেকে এক ধরনের তরল (Necter) পদার্থ ক্ষরিত হয়। উজ্জল লাল রং আর ক্ষরিত তরলের মিস্টি গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শিকার পত্র ফলকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারপর বিশ্বাস করেন রাসেল ভাই, প্রতিটি পত্রফলকের ভিতরে তিনটি করে সূচালো অংশ থাকে এদের ট্রিগার হেয়ার বলে। মূলত এগুলো তাদের উদ্দীপনা গ্রহণকারী অংশ হিসেবে কাজ করে। যখনই শিকারটি সেই ট্রিগার হেয়ারগুলোর একটিকে স্পর্স করে তখনই মূল কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যায়। শিকারি পত্রফলক অপেক্ষায় থাকে কখন শিকার আরেকবার ঐ ট্রিগারহেয়ার গুলোকে স্পর্স করবে।

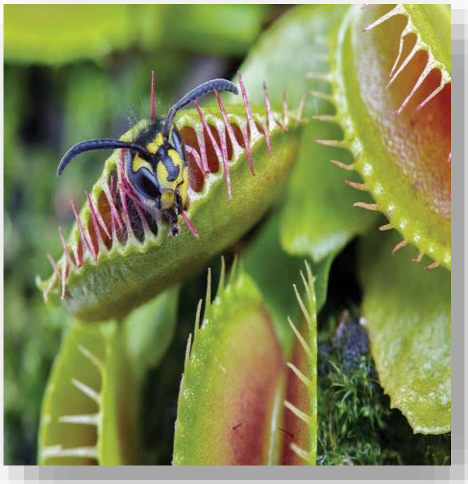

এদিকে নেকটারের চটচটে আঠালো বৈশিষ্ট্যের কারণে শিকারও সহজে বের হতে পারে না। আতঙ্কে শিকার নড়াচড়া করতে গেলেই ট্রিগার হেয়ারে দিত্বীয় বার চাপ লাগতেই পত্র ফলক দুটো বন্ধ হয়ে যায়। ফলক গুলো চোখের পাতা ফেলার চেয়ে চারগুণ বেগে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিটি ফলকের উন্মুক্ত প্রান্তে কতকগুলো সূচালো অংশ থাকে এদের ট্রাইকোম বলে। ফাঁদ গুলো চেপে জাবার সাথে সাথে উভয়পাশের ট্রাইকোম গুলো ভালুক ধরবার ফাঁদের মতো বন্ধ হয়ে যায়। বন্দী হয়ে জাওয়া পতঙ্গ তখন বের হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে , যেটা তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ফাঁদ বন্ধ হবার সাথে সাথে ফলকের অভ্যন্তর ভাগ থেকে এক ধরনের আঠালো তরল নিঃসৃত হতে থাকে। আর শিকার যত বেশি নড়াচড়া করে নিঃসৃত আঠালো তরল তত বেশি করে নির্গত হতে থাকে ফলস্বরূপ দুরভেদ্য জালে সে আটকা পরে যায়।

উন্মুক্ত প্রান্তের কোষ গুলো থেকে আরেক ধরনের আঠালো পদার্থ বের হয় যা ফাঁদটিকে আরও শক্তভাবে বন্ধ করে দেয়। এক অথবা দুই ঘণ্টার মধ্যে ফাঁদটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর এত সময় ধরে মুখের মতো কাজ করা পত্রফলক পাকস্থলীতে পরিণত হয়। ফলক গাত্র থেকে পরিপাককারী এনজাইম বের হতে থাকে, যা শিকারের দেহের নরম অংশ কে বিয়োজিত করে পুষ্টি উপাদান গুলো শোষিত করে। এক সপ্তাহ পর ফাঁদের মুখ আবার খুলে যায় আর ভেতরে পরে থাকা পতঙ্গের দেহাবশেষ বের হয়ে আসে।

মূলত শিকারকে উজ্জল রং আর মিষ্টি গন্ধে মোহীত করে ফাঁদে ফেলে দেখেই এর নাম রাখা হয়েছিল ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ। বলা হয়ে থাকে গঠন ও শিকার প্রক্রিয়ার জন্য কার্নিভোরাস উদ্ভিদ গুলোর মাঝে সবচেয়ে বৈচিত্রময় হল এই ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ।

Pitcher plants

(*Nepenthes*)

এবার আসা যাক কার্নিভোরাস দের আরেক সদস্যের দিকে। সাহেবী কেতায় এদের Pitcher Plants বলা হয়। বাংলায় কলসি/কলস গাছ। অনেকের কাছে এরা Monkey Cups নামে পরিচিত। China, Indonesia, Malaysia,Philipines প্রভৃতি এলাকায় এদের

দেখা যায়। এমনকী আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, শ্রী লংকা তেও এদের এক দুইটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। এরা লম্বায় ১৫ মি বা তার চেয়ে বেশি এবং ব্যাসে ১সে মি বা তার কম হতে পারে।

ফাঁদের আকৃতি অনেকটা কলসের মতো। সরু কাণ্ড অগ্রসর হয়ে এই কাঠামো গঠন করে। ফাঁদের প্রবেশ ভাগকে Peristome বলে। Peristome অনেকক্ষেত্রেই রঙ্গিন হয়ে থাকে। এই প্রবেশ ভাগ Necter নামক গ্রন্থি নিঃসৃত তরলের প্রভাবে পিচ্ছিল হয়ে থাকে যা শিকারে সহায়তা করে। প্রবেশ ভাগের উপরে ক্ষুদ্র ঢাকনার মতো অংশ থাকে। একে Lid বলা হয়। লিডের ভেতরের দিকের অংশে অশংখ্য ক্ষুদ্র রোম বিদ্যমান থাকে।

নেকটারের মিষ্টি গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শিকার এসে লিডের নিচে এসে বসে এবং পরবর্তীতে তরলের প্রভাবে মাতাল হয়ে পিছলে ভেতরের গহ্বরে থাকা মৃত্যু স্বরূপ বিপাকীয় এঞ্জাইমে পতিত হয়।

অনেক সময় শিকার গহ্বরের প্রবেশভাগে এসে বসে এবং নেক্টারের প্রভাবে মাতাল হয়ে কলসের গহ্বরের ভেতরে থাকা এনজাইমে পতিত হয়। পরবর্তীতে বিপাকীয় এনজাইমের প্রভাবে শিকারের দেহের নরম অংশ বিয়োজিত হয় এবং পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

এই প্রজাতির খাদ্য তালিকায় ক্ষুদ্র পতঙ্গ থেকে শুরু করে ইঁদুর কিংবা টিকটিকিও বিদ্যমান।

Sundews

(Dosera)

সানডিউ -১৯৪ প্রজাতিতে বিভক্ত এই উদ্ভিদের দেহ মিউসিলেজ নিঃসরণ কারী গ্রন্থি দিয়ে পূর্ণ থাকে। শিকারের সময় গ্রন্থি থেকে মিষ্টি গন্ধ যুক্ত মিউসিলেজ নিঃসৃত হয় শিকার মূলত এই গ্রন্থি নিঃসৃত পদার্থের গন্ধ পাতায় এসে বসে আর তখন ই চিকন পাতা অনেকটা কেঁচোর মতো শিকারের গায়ে পেচিয়ে যায়।

গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত আঠালো মিউসিলেজ এর প্রভাবে শিকার আর পালাতে পারে না। ধীরে ধীরে পেচিয়ে ধরা পাতার থেকে নিঃসৃত মিউসিলেজের প্রভাবে শিকার মারা যায়।

ফাঁদে পড়ার পনেরো মিনিটের মাঝে এরা শিকারকে মেরে ফেলে।

সকল প্রজাতির পাতা মূলত তাদের শিকারের অনুসারে নড়াচড়া করাতে পারে। শিকার পাতায় বসার সাথে সাথে পাতাগুল তারা পেচিয়ে একেবারে কেন্দ্রের দিকে নেবার চেস্টা করে। গ্রন্থি নিঃসৃত পরিপাক কারী এঞ্জাইমের সাহায্যে এরা শিকারের দেহের নরম অংশ কে বিয়োজিত করে পুষ্টি উপাদান শোষণ করে।

এত কিছুর পর হয়তো মনে হতে পারে প্রকৃতি নির্মম। কিন্তু এই নির্মমতার মধ্যে দিয়েই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে সকল জীবের ই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় রয়েছে বিশেষ ভূমিকা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের খবর

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

জুলাই মাসে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে। সেগুলো হল:

১. ৪-৫ জুলাই: উপচ্ছায়া চন্দ্রগ্রহণ

জুলাইয়ের শুরুতেই চন্দ্রগ্রহণের সাক্ষী হয়েছি আমরা। একে উপচ্ছায়া চন্দ্রগ্রহণ বলার কারণ হল এ সময়ে পৃথিবীর প্রান্তীয় আবছা ছায়ার মধ্য দিয়ে চাঁদ অতিক্রম করে। চন্দ্রগ্রহণের সময়ে দিনের আলো থাকায় বাংলাদেশে এটি দেখা যায় নি।

২. ১৪ জুলাই: পৃথিবীর নিকটে আসবে বৃহস্পতি গ্রহ

আগামী ১৪ই জুলাইয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে অবস্থান করবে বৃহস্পতি গ্রহ। সেদিন এটি ৬১ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করবে। উল্ল্যেখ্য, ১৯৫১ ২রা অক্টোবর বৃহস্পতি গ্রহ সবচেয়ে নিকটে এসেছিল। সেদিন এটি ৫৯ কোটি কিলোমিটার দূরে ছিল।

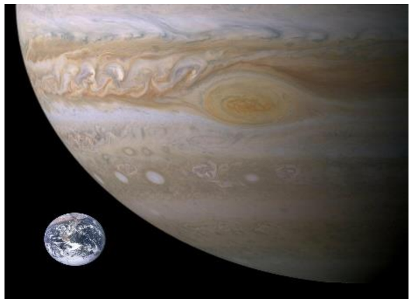

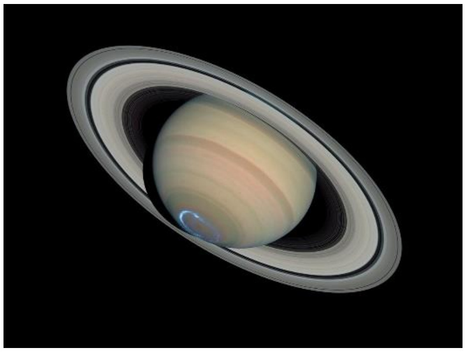

৩. ২০ জুলাই: পৃথিবীর নিকটে আসবে শনি গ্রহ

আগামী ২০শে জুলাইয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে অবস্থান করবে শনি গ্রহ। সেদিন এটি ১২০ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করবে।

৪. ২৮-২৯ জুলাই: দ্বৈত উল্কাবৃষ্টি

আগামী ২৮-২৯শে জুলাই দেখা মিলবে দ্বৈত উল্কাবৃষ্টির। এ সময়ে ঘণ্টায় ২০-এর অধিক উল্কা বর্ষণ ঘটবে বলে আশা করা যায়। এ সময়ে আকাশে চাদের ৬৬% দেখা যাবে।

বটস টার্মিনাল

মাহমুদ হাসান আসিফ

- আচ্ছা শামস! তুমি আমার কথা আমলে নিবে কবে? যেদিন বোমাগুলো ফাটবে ওইদিন?

- না স্যার।

- তাহলে আর কতবসময় দেব তোমাকে? তুমি নাকি ট্রমা স্কুয়াডের হেড! যারা নাকি সব পারে!

- স্যার একটু সংশোধন হবে। সব পারিনা। সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চটা পারি।

- ওই একই! যাকগে। খবর এসেছে আজকেও নাকি ওরা ১০ টা রকেটে করে মঙ্গলে মানুষ পাঠিয়েছে। এরপর নাকি আর কোনো এক্সট্রা মানুষ নিবেনা।

- স্যার, ভুলে যাবেন না আমাদেরও ৪২ টা রকেট রেডী হচ্ছে। আর মাত্র অল্প সময়ের অপেক্ষা।

- কিন্তু শামস, তুমি হয়তো এটা জানোনা ওরা সব গুটিয়ে নিয়ে চলে যাবে এবং পারমানবিক বোমাগুলো ফাটিয়ে দিবে যাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়, আমরা যাতে যেতে না পারি। তখন ৪২ টা রকেট দিয়ে কী হবে? কম জনসংখ্যাই নাকি

ওদের উদ্দেশ্য। ওদের কন্টিনেন্টের অবশিষ্ট মানুষগুলোকেও নাকি নিবেনা।

- এটা নতুন শুনলাম।

- তো এই পরিস্থিতিতে তোমার কী করা উচিত?

- আপনি টেনশন করবেন না, স্যার। গত কিছুদিন যাবতই প্ল্যান সাজাচ্ছি।

- কী?

- যেহেতু সব গুটিয়ে চলে যাবে, ওদের কমপক্ষে আরো ১ সপ্তাহ লাগবে সব গুটিয়ে গ্রাউন্ড স্টেশনে সব কিছু একটিভ করে যেতে।

- গ্রাউন্ড স্টেসন দিয়ে কী হবে?

- বোমাগুলোতো স্যার প্রশান্ত মহাসাগর, ভূ- মধ্যসাগর, আরব সাগরের তলদেশে সাবমেরিনে রিলোড করা। ওগুলোকে ফাটাতে চাইলে মঙ্গল থেকে সুইচ টিপে দিলাম আর ফেটে গেলো তা তো আর না। আগে একটা কমান্ড সিগনাল মঙ্গল হতে গ্রাউন্ড স্টেশনে পৌঁছালে স্বয়ংক্রিয় রোবট তা সাবমেরিনে পাঠাবে।

- তো হাতে তো মাত্র ৭ দিন সময় আছে, তাও তো শিওর না। কীভাবে কী করবে?

- ধৈর্য ধরুন স্যার। প্ল্যান করা আছে।

- ধৈর্য? এই ১৫ দিনে কী করলো তোমার বাহিনী? বোগাস যত্তসব!

- স্যার এভাবে বলবেন না। তারা সবাই চূড়ান্ত যোগ্যতাধারী। মিশনটা এতটা সহজ নয়।

- কাকে না পাঠানোর কথা ছিল স্পাই হিসেবে? কাকে পাঠাবে? এখান থেকে তো কিছুই করতে পারবেনা।

- কাউকে পাঠাব না, স্যার।

- মানে? ঘরে বসে? মামা বাড়ির ব্যাপার?

- না স্যার। কাউকে পাঠাবনা। কারন আমি নিজে যাব এই মিশনে। একা।

- কীভাবে কী করবে? যাবে তুমি? নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও?

- স্যার, মৃত্যু এভাবেও নিশ্চিত, ওভাবেও নিশ্চিত। কিন্তু এ মিশনে আমি সফল হয়ে ছাড়ব!

- কী করবে? কীভাবে যাবে?

- আমার মূল প্ল্যান হচ্ছে ওখানকার কন্ট্রোল হেডকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে সব পারমানবিক অস্ত্র লাইফটাইম ডিজেবল করে দেয়া এবং কমান্ড সেকশন হ্যাক করে নেয়া।

- আই সী... বাট হাউ ইটস পসিবল?

- আমার বাহিনীই আমাকে সহায়তা করবে। ওখানকার চীপ ক্লাউডের একটা অংশ আমার বাহিনী হ্যাক করেছে। কন্ট্রোল হেড এর সহকারীর সকল ডিটেইলস আমরা হ্যাক করতে পেরেছি। এ টু জেড। তার যে সকল ডিটেইলস চীপ ক্লাউডে ছিল সবটাই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমার সাথেই তার দৈহিক গড়ন ৯৩% মিলেছে। আজকে আমার একটা প্লাস্টিক সার্জারি এবং আইরিশ সার্জারি হবে। আমার ফেস, চুল, দাঁড়ি, আইরিশ ট্রেসিং হুবহু ওই লোকের মত করা হবে। বডির সাথে সব এডজাস্ট হতে ৩ দিনের মত লাগবে।

- বাহ। নাইস প্ল্যান। কিন্তু লাভটা কী? সে ভিতরে, তুমি বাইরে। তাকে ভেতরে রেখে তোমাকে কীভাবে এ্যালাও করবে? যতই তার মত চেহারা বানাও।

- ধৈর্য ধরুন এবং শুনুন। আমাদের বানানো বটস টার্মিনালে কিছু মহামূল্যবান, স্মার্ট ও সু- চতুর ন্যানোবটস আছে। যাদেরকে খালি চোখে দেয়া যায়না। অতিক্ষুদ্র রোবট। কোনো রকম ট্রেসিং এবং ইলেক্ট্রো- ম্যাগনেটিক রেজোনেন্সেরও প্রভাব নেই এদের উপর। এরা নিজের ওজনের ১৭৭ গুণ বেশি ওজন ধারন করতে সক্ষম। ওগুলোর স্টোরেজে বিষ পুশ করে ২০ লক্ষ ন্যানোবটস পাঠানো হবে। মাছির মত ডিজাইন করা হয়েছে যাতে খুব দ্রুত উড়তে পারে। ওগুলো খুব সহজেই ওখানকার সিকিউরিটিকে কাঁচকলা দেখিয়ে ঐ সহকারী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ওর নাক,

মুখ দিয়ে ন্যানোবটস গুলো শরীরের ভেতরে ঢুকে যাবে। রাতে সে ঘুমানোর পর ন্যানোবটসগুলো বিষ ছড়াতে শুরু করবে। ঘুমের ঘোরে ৫ মিনিটেই তার মৃত্যু ঘটবে।

- ঘটলো। ডেডবডি? ডেডবডির কী হবে? বাতাসে মিলিয়ে যাবে?

- ঠিক তা না। আবার অনেকটা তা- ই।

- মানে? বলতে চাচ্ছোটা কী?

- মানে হচ্ছে ন্যানোবটসগুলোই তাকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। কোনোকিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। আগেই বলেছি তারা খুবই স্মার্ট। এখন বুঝতে পারছেন তো? ওদের স্টোরেজ টা ওভাবেই তৈরি করা হয়েছে যাতে অন্তত ৫০ গুণ ওজনই নিতে পারে। যদি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ওরা ফাঁক ফোঁকর খুঁজে টার্মিনালে ফিরিয়ে না আনা যায়, তাহলে ঠিক ৪৮ ঘন্টা ১ সেকেন্ড সময়ে সব ন্যানোবটস ইন্টার্নালি বিস্ফোরিত হবে। অনেকটা সুইসাইড স্কুয়াডের মত। তবে আমার আশা আছে তাদেরকে বার ফিরিয়ে আনা যাবে।

- ইন্টারেস্টিং! কিন্তু তুমি ওখানে যাবে কীভাবে? কীভাব ফিক্স করবে নিজেকে ঐ লোকের রিপ্লেসে?

- হ্যাঁ, বলছি শুনুন। আমার বাহিনীতে ৬৩ জন চৌকস হ্যাকার আছে। ওরা কাল- পরশুর মধ্যে ওখানকার প্রতিরক্ষা সিস্টেম হ্যাক করবে। কিন্তু যতটা সহজ ভেবেছিলাম ততটা না। ৮৮ টা প্রটোকল দিয়ে ওদের প্রতিরক্ষা মোড়ানো। হ্যাক হলেও সর্বোচ্চ ১৩- ১৪ মিনিট তা অচল থাকবে। ওদের রোবটগুলোও ততক্ষণ ডিজেবল থাকবে। তারপর আবার এক্টিভ হবে।

- তারমানে ঐ ১৩ মিনিটে তুমি ওখানে ঢুকবে?

- এক্সেক্টলী!

- ওকে। আমরা তোমাকে সর্বোচ্চ সহায়তা করব। কিন্তু গিয়ে করবেটা কী? কিভাবে বাকিটা সামলাবে?

- সেটা নাহয় ফিরে এসেই বলি? আগের মতই চলবে আবার পৃথিবী!

এই বলে ট্রমা স্কুয়াড প্রধান শামস বিন হাসান ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি নিয়ে জেনারেলের চেম্বার ত্যাগ করলেন।

পরিশিষ্ট:

১২৬ বছর পর

- আম্মু, আম্মু! এটা কে?

- ইনি হচ্ছেন ট্রমা ক্যাপ্টেন শামস, শামস বিন হাসান মা।

- আম্মু ওকে কেন দেখাচ্ছে সবগুলো চ্যানেলে?

- ওউ হ্যাঁ। ভুলেই তো গিয়েছিলাম। ভুলাটা মোটেও ঠিক হয়নি। আজকে তো ক্যাপ্টেন শামস দিবস।

- আম্মু, ও কী করেছে?

- আজ থেকে ১২৬ বছর আগ্ব এই দিনে ইনিই আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন দুষ্টুলোকেদের হাত থেকে। উনার বুদ্ধিমত্তা, চৌকস দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এত বড় হুমকির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

- আম্মু হুমকি মানে কী?

- এটা তুমি এখনো বুঝবেনা মা। আরেকটু বড় হও। এটা জেনে রাখো আমাদের জাতীয় বীর হচ্ছে ক্যাপ্টেন শামস। বলোতো তাহলে জাতীয় বীর কে?

- ক্যাপ্লেন, শাস।

- ক্যাপ্লেন না মা, ক্যাপ্টেন। আর শাস না শামস।

- আচ্ছা। শাম- স...

- এবার আতা গাছে ছড়াটা শুনাও দেখি। কালকে স্কুলে ম্যাডাম এটা জিজ্ঞাসা করবেন কিন্তু!

- আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম......

সমাপ্ত

কুইজ!

১. ‘ক’ যদি কোন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয়, তাহলে ($ক^{২}$+৩ক+১১) কোন শর্তে মৌলিক সংখ্যা হবে?

২. একটি প্রকাশনা ভাবলো তারা বইয়ে অফার দিবে। হয় তারা ৫০% ডিসকাউন্ট দিবে। নাহয় একটি কিনলে আরেকটি ফ্রি দিবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রেতা থাকলে, ৫০% ডিসকাউন্ট নাকি একটির সাথে একটি ফ্রি কোনটি করলে প্রকাশনার লাভ বেশি?

৩. সুডোকু:

8	2			6	9	7	4	3
3			4	5			1	9
				8	3	5		2
		2	5					7
4	5			7			3	
		3	9		4	1	5	
6		8	2	1	5		7	
		4						5
		7	8	4			2	

৪. বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব মেনে প্রচন্ড বেগে চললে কি কোন বস্তু ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ বিবরে রূপান্তর হতে পারে?

৫. আগুনের শিখা কেমন পদার্থ?

৬. নীচের ধারার পরবর্তী তিনটি সংখ্যা কি হবে? ধারাটির কোন নামকরণ করা যায়? ধারাটির বিশেষত্ব কি?

ধারা:

৫৫	৮৯	১৪৪	২৩৩	৩৭৭	৬১০	৯৮৭	১৫৯৭	২৫৮৪	৪১৮১	৬৭৬৫

৭. আলোর বেগ যদি বাংলাদেশের ট্রেনের বেগের মত হতো, তাহলে বাস্তব জীবনে এর কিরকম প্রভাব পড়তো?

কুইজে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত একজন পাবে আমাদের পক্ষ থেকে উপহার!

উত্তর প্রদানের জন্য উত্তরগুলো প্রয়োজনীয় সমাধান ও ব্যাখ্যাসহ ইমেইল করতে হবে। উল্লেখ্য, ইমেইলে চাইলে ওয়ার্ড ফাইল, হাতে লিখে কিংবা টাইপ করে তিনভাবেই উত্তর পাঠানো যাবে। ইমেইলে আপনার পূর্ণ নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেশন, ব্যাচ, শ্রেণি/বর্ষ, মোবাইল নম্বর, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক ইত্যদি তথ্য পাঠাতে হবে।

উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ: আগস্ট ৫, ২০২০

উত্তরের যথার্থতা, ব্যাখ্যার গুরুত্ব ও ধরনের উপর নির্ভর করে নম্বর দেয়া হবে এবং বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। উত্তর পাঠানোর ইমেইল অ্যাড্রেস: quiz@bigganangon.shikkhaweb.com

কোভিড-১৯ সময়কালীন বিশ্বের কিছু চিত্র

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

করোনায় ফাঁকা মক্কা নগরীর পবিত্র কাবা

ছবি: AFP/Abdel Ghani Bashir

করোনায় অসহায় গৃহহীন

ছবি: REUTERS/Hannah McKay

চিকিৎসা সেবায় জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তৈরি লেখা

ছবি: REUTERS/Andrew Kelly

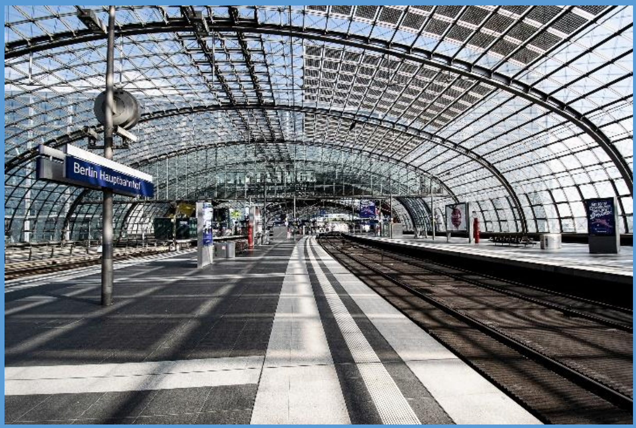

করোনায় ফাঁকা ব্যস্ত বার্লিন সেন্ট্রাল স্টেশন

ছবি: Rebecca Holm

ফাঁকা প্যারিসের লা কনকর্ড স্কয়ার

ছবি: Patrick Zachmann/Magnum Photos

নিস্তব্ধ ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেনা

ছবি: David McNew/Getty Images

রক্ত

কাওসার মাহমুদ সাগর

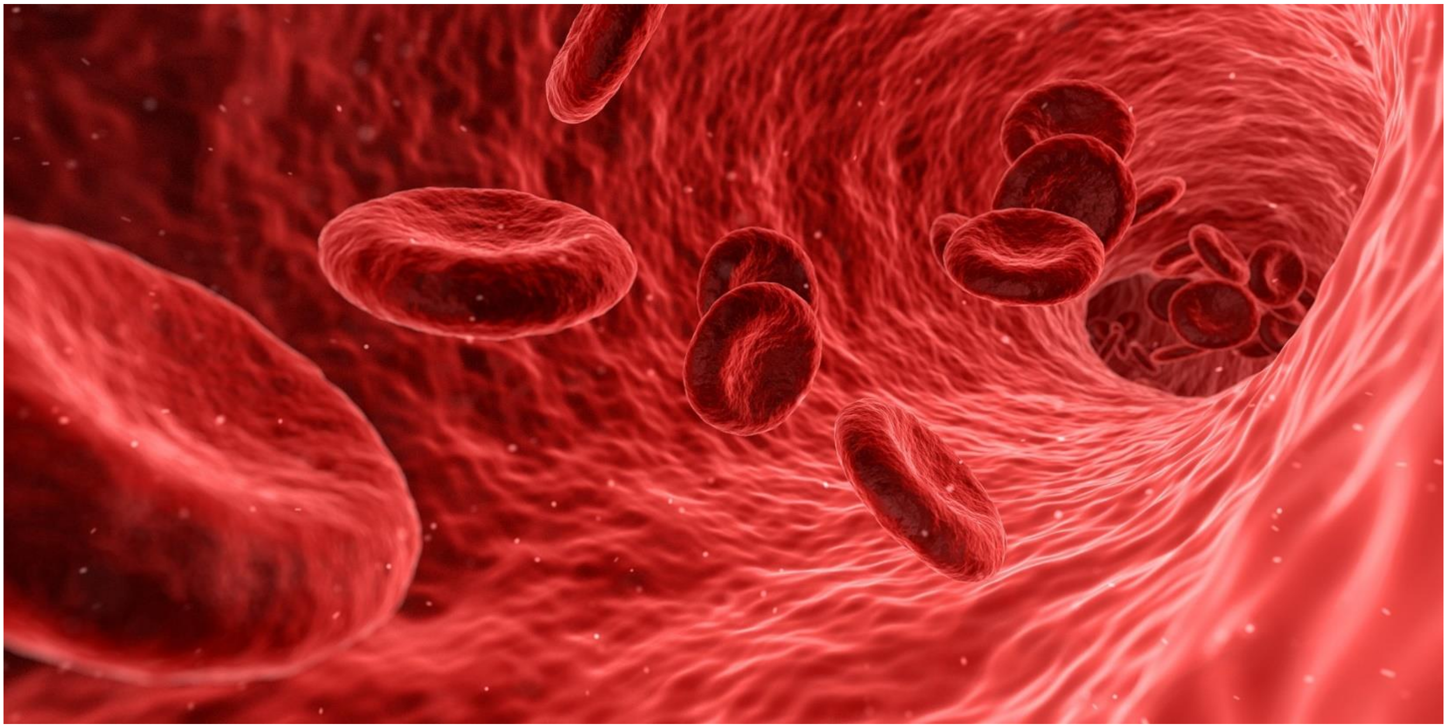

রক্ত (Blood) হল উচ্চশ্রেণীর প্রাণিদেহের এক প্রকার কোষবহুল, বহু জৈব ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত সামান্য লবণাক্ত, আঠালো, ক্ষারধর্মী ও লালবর্ণের ঘন তরল পদার্থ যা হৃৎপিন্ড, ধমনী, শিরা ও কৈশিক জালিকার মধ্য দিয়ে নিয়মিত প্রবাহিত হয়।

রক্ত একধরনের তরল যোজক কলা। রক্ত প্রধানত দেহে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ পরিবাহিত করে। রক্ত হল আমাদেরে দেহের জ্বালানি স্বরূপ। গড়ে মানবদেহে ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে। রক্তের PH সামান্য ক্ষারীয় অর্থাৎ ৭.২ - ৭.৪। মানুষের রক্তের তাপমাত্রা ৩৬ - ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। রক্তের প্রধান উপাদান দুইটি। যথা:

(ক) অজৈব পদার্থ

(খ) জৈব পদার্থ

(ক) অজৈব পদার্থ

রক্তরসে ৪ ধরনের অজৈব পদার্থ দেখা যায়। এগুলো হল: পানি ৯১-৯২%, কঠিন পদার্থ ৭-৮% যার মধ্যে আছে ক্যাটায়ন (Na+, K+, Ca++, Mg++, P+++, Fe++, Cu+, Mn++, Zn++, Pb++ ইত্যাদি) ও অ্যানায়ন (Cl−, HCO−, PO43−, SO42− ইত্যাদি) এবং ০.৯% গ্যাসীয় পদার্থে যার মধ্যে আছে কার্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।

(খ) জৈব পদার্থ:

রক্ত রসে মাত্র ৭.১%-৮.১% জৈব পদার্থ থাকে। এর মধ্যে অধিক পরিমাণে থাকে প্লাজমা প্রোটিন- গড়ে ৬-৮ গ্রাম/ডেসি লি.। প্লাজমা প্রোটিনগুলো হচ্ছে - অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফিব্রিনোজেন। এছাড়াও অন্যান্য জৈব পদার্থগুলো হল: স্নেহ দ্রব্য (নিউট্রাল ফ্যাট, কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড, লেসিথিন ইত্যাদি), কার্বোহাইড্রেট (গ্লুকোজ), অপ্রোটিন নাইট্রোজেন দ্রব্য (অ্যামাইনো এসিড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিন, ক্রিয়েটিনিন, জ্যানথিন ইত্যাদি), রঞ্জক দ্রব্য (বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন), বিভিন্ন ধরনের এসিড (যেমন: সাইট্রিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড), হরমোন, ভিটামিন, এনজাইম, মিউসিন ও অ্যান্টিবডি।

রক্ত শরীরের যেসব কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে

১) এর মাধ্যমে পাচিত খাদ্যবস্তু, হরমোন, উৎসেচক ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

২) রক্তরসের প্রোটিনের পরিমাণ রক্তের সান্দ্রতা (ঘনত্ব), তারল্য (Fluidity), প্রবাহধর্ম (Rheology) বজায় রাখে এবং পানির অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩) অ্যান্টিবডি, কম্প্লিমেন্টস ইত্যাদি প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ উপকরণ রক্ত ধারণ করে।

রক্তের তরল ভাবের প্রধান কারন রক্ত রস।

৪) রক্তে বিদ্যমান প্রোটিন বাফার হিসবে কাজ করে এবং দেহের ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা করে।

রক্তের প্রোটিন উপাদান

১) রক্তের অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন (অ্যান্টিবডি গামা/ইম্যুনো গ্লোবিউলিন)

২) প্রতঞ্চক ও প্রতিতঞ্চক উপাদান সমূহ

৩) ফাইব্রোনেক্টিন ও ভিট্রোনেক্টিন

৪) কম্প্লিমেন্টস (২০টির বেশি)

৫) সি আর পি

৬) ট্রান্সফেরিন

৭) ট্রান্সথাইরেটিন

৮) সেরুলোপ্লাজমিন

৯) হ্যাপ্টোগ্লোবিন

১০) হিমোপেক্সিন

১১) সাইটোকাইনস

১২) লাইপোপ্রোটিন ও কাইলোমাইক্রন

১৩) এল বি পি

১৪) গ্লুকোজ

১৫) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বিকণা, খনিজ লবন এবং ভিটামিন

১৬) হরমোন ও এন্টিবডি

১৭) বর্জ্যপদার্থ, যেমন: কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটেনিন

রক্তকনিকা

মানবদেহে তিন ধরনের রক্তকনিকা রয়েছে। যথাক্রমে--

১) লোহিত রক্তকনিকা

২) শ্বেত রক্তকনিকা

৩) অনুচক্রিকা

১) লোহিত রক্তকনিকা

(ইংরেজীর Erythrocyte) লোহিত রক্তকণিকা রক্তের সর্বপ্রধান কোষ বা কণিকা যা মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের কলাগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের প্রোটিন অণুতে পূর্ণ থাকে। হিমোগ্লোবিন 'হিম' ও 'গ্লোবিন' এর সমন্বয়ে গঠিত। ' হিম' যৌগের কারনে লোহিত কনিকা লাল হয়ে থাকে।

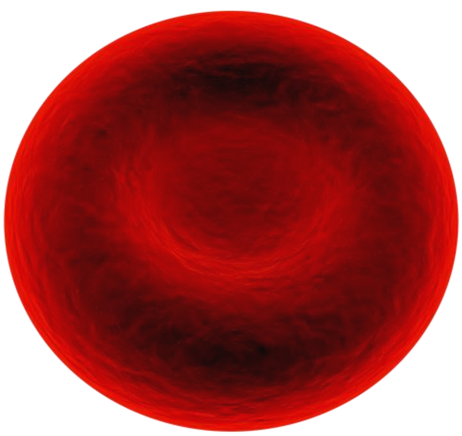

প্রতিটি লোহিত রক্তকণিকাতে প্রায় ২৮০ মিলিয়ন হিমোগ্লোবিন অণু থাকে। এই হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমেই দেহের ৯৮% অক্সিজেন পরিবাহিত হয়। বাকী ২% বহন করে রক্তরস। অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সি-হিমোগ্লোবিন গঠন করে। পরিনত লোহিত কনিকা দেখতে দ্বি-অবতল হয়ে থাকে। মানবদেহে প্রতি সেকেন্ডে ২.৪-২.৬ মিলিয়ন লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। কণিকাগুলি অস্থিমজ্জায় উৎপত্তি লাভ করে এবং সমগ্র দেহে ১০০-১২০ দিন সংবহনের পর যকৃত এবং প্লীহায় ধ্বংস হয়। এটাকে ভেঙ্গে ফেলার এবং সৃষ্টির কাজ করে ম্যাক্রোফাজ নামের শ্বেত রক্তকণিকা। একটি লোহিত কণিকার সমস্ত দেহ ঘুরে আসতে প্রায় ২০ সেকেন্ড লাগে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহে ২০ থেকে ৩০ ট্রিলিয়ন লোহিত রক্তকণিকা থাকে।

লোহিত কনিকা সম্পর্কিত রোগ:শরীরে লোহিত কণিকা-সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের মধ্যে আছে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা, হিমোলাইসিস বা লোহিত কণিকাসমূহের অতিরিক্ত ভাঙন ইত্যাদি।

লোহিত কনিকার সংখ্যা কমে গেলে যেসব খাবার খেলে বাড়তে পারে লোহিত কনিকার সংখ্যা-

১) খেজুর

২) লেবু

৩) দই এবং হলুদ মিক্সড করে খাওয়া

৪) বিটরুট বা বীটের মূল

৫) কলা, তিল বীজ এবং পালং শাক

এছাড়া ডালিম বা আপেল খাওয়া যেতে পারে।

২) শ্বেত রক্তকনিকা

শ্বেত রক্তকণিকা (ইংরেজি: White blood cell or Leucocytes) মানবদেহের রক্তে বর্নহীন, নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং তুলনামূলকভাবে স্বল্পসংখ্যক ও বৃহদাকার যে কোষ দেখা যায় তাকে শ্বেত রক্তকণিকা বলে। প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রায় ৫০০০-৯০০০। শ্বেত রক্তকণিকা দেহের প্রতিরক্ষার কাজ করে। এটি নানা ধরনের সংক্রামণকারী রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। পাঁচটি ভিন্ন ধরনের লিউকোসাইট রয়েছে। তবে তারা প্রত্যেকেই বোন ম্যারোর মধ্যকার এক ধরনের মাল্টিপোটেন্ট কোষ থেকে সৃষ্টি হয় যাকে হেমাপয়েটিক স্টেম সেল বলা হয়। তারা মানবদেহে ৩-৪ দিন থাকে। রক্ত এবং লসিকা সহ সারা মানবদেহেই লিউকোসাইট পাওয়া যায়। গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমের দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে শ্বেত রক্তকণিকাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা:

ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট (দানাবিহীন)

আকারের ভিত্তিতে এরা আবার দুই প্রকার যথা:

১) লিম্ফোসাইট

২) মনোসাইট

খ) গ্রানুলোসাইট (দানাযুক্ত)

নিউক্লিয়াসের আকারের ভিত্তিতে এরা আবার তিন প্রকার। যথা:

১) নিউট্রোফিল

২) ইওসিনোফিল

৩) বেসোফিল

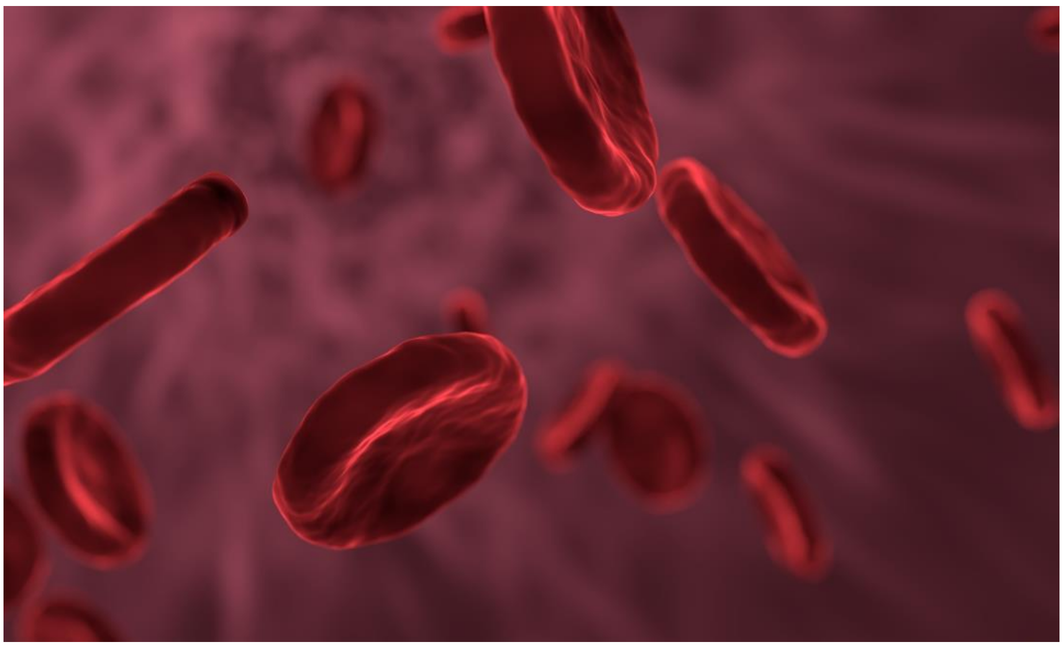

রোগ: শ্বেত কনিকা জনিত সবচেয়ে মারত্মক রোগ হলো লিউকেমিয়া ক্যান্সার। শ্বেত কনিকার মাত্রাধিক্যের কারনে এই রোগ হয়ে থাকে। এছাড়া জ্বর, পেটে তীক্ষ্ণ ব্যথা, বমি বা বমি বমি ভাব, কাশি, ডায়রিয়া, দূর্বলতা, অবসাদ, ঠান্ডায় কাঁপুনি, তরল জমা, বুকে ব্যথা, মুখে জ্বালাও হয়ে থাকে।

৩) অনুচক্রিকা

অণুচক্রিকা (ইংরেজি: Platelet) নিউক্লিয়াসবিহীন, গোলাকার বা ডিম্বাকার আকৃতির বর্ণহীন সাইটোপ্লাজমীয় চাকতি বিশিষ্ট রক্তের ক্ষুদ্রতম কোষকে অণুচক্রিকা বলে। এর আয়ু বড়জোর ৫-৯ দিন। অণুচক্রিকা বৃদ্ধির প্রাকৃতিক উৎস। স্তন্যপায়ীদের দেহে এরা সংবাহিত হয় এবং রক্ততঞ্চনে অর্থাৎ ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বাঁধায় নিয়োজিত থাকে। রক্ততঞ্চনের ১১টি ফ্যাক্টরের ভিতরে হেপারিন রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে।

অনুচক্রিকা জনিত রোগ:অণুচক্রিকার সংখ্যা খুব কমে গেলে মারাত্মক রক্তক্ষরণ হতে পারে। আবার অণুচক্রিকার সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে তা রক্তনালিকাগুলোকে বাঁধা দিয়ে থ্রম্বোসিস ঘটাতে পারে এবং এমন পরিস্থিতিতে স্ট্রোক, মাইওকার্ডিয়াল ইনফ্র্যাকশন, ফুসফুসীয় ধমনীরোধ এবং রক্তনালিকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অণুচক্রিকার অস্বাভাবিকতা বা রোগকে থ্রম্বোসাইটোপ্যাথি বলা হয়। যা হতে পারে অণুচক্রিকা কমে গেলে (থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া), অণুচক্রিকার স্বাভাবিক কাজ বাধাগ্রস্ত হলে (থ্রম্বোস্টেনিয়া) কিংবা অণুচক্রিকার সংখ্যা বেড়ে গেলে (থ্রম্বোসাইটোসিস)। এছাড়া বেশকিছু রোগের কারণেও অণুচক্রিকা কমতে পারে যেমন ডেঙ্গু বা হেপারিন-ইনডিউজড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া (এইচআইটি)।

অনুচক্রিকা বাড়ায় যেসব খাবার

১) পেপে

২) কুমড়া

৩) ডালিম

৪) ভিটামিন সি যুক্ত খাবার। যেমন--লেবু, কমলা, টেমেটো, আমলকি, পেয়ারা ইত্যাদি।

এছাড়া দুধ, মাছ, মুরগী প্লেটেলেট সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

রক্ত পরীক্ষার প্রকারভেদ

জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণ

একটি মৌলিক বিপাকীয় প্যানেল সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, বাইকার্বোনেট, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন (বিইউএন), ম্যাগনেসিয়াম, ক্রিয়েটিনিন, গ্লুকোজ এবং কখনও কখনও ক্যালসিয়াম পরিমাপ করে। যে পরীক্ষাগুলি

কোলেস্টেরলের মাত্রায় ফোকাস করে সেগুলি এলডিএল এবং এইচডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা, পাশাপাশি ট্রাইগ্লিসারাইড স্তরগুলি নির্ধারণ করতে পারে।

সাধারণত ৯০ দিন পর পর, অর্থাৎ তিন মাস পর পর রক্ত দেওয়া যাবে।

আণবিক প্রোফাইল

- প্রোটিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস (সাধারণ কৌশল - একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা নয়)
- লিভার ফাংশন পরীক্ষা
- পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (ডিএনএ)। খুব অল্প পরিমাণে রক্তের সাথেই এখন ডিএনএ প্রোফাইলিং সম্ভব। এটি সাধারণত ফরেনসিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়, তবে এটি এখন অনেক রোগের ডায়াগনস্টিক প্রক্রিয়ারও একটি অংশ
- যৌন রোগে

সেলুলার মূল্যায়ন

- সম্পূর্ণ রক্ত গণনা (CBC test)
- হেমাটোক্রিট
- এমসিভি (গড়ের কর্পাসকুলার ভলিউম)
- মিডিয়াম কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন ঘনত্ব (এমসিএইচসি)
- এরিথ্রোসাইট পলুপাতের হার (ESR)
- ক্রস ম্যাচিং, রক্ত সঞ্চালন বা প্রতিস্থাপনের জন্য রক্তের ধরণ নির্ধারণ।

রক্তদান নিয়ে কিছু তথ্য

ক) রক্ত যারা দিতে পারবেন- ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মধ্যে শারীরিকভাবে সুস্থ নারী ও পুরুষ রক্ত দিতে সক্ষম। এক্ষেত্রে পুরুষের ওজন থাকতে হবে অন্তত ৪৮ কেজি এবং নারীর অন্তত ৪৫ কেজি।

এছাড়া রক্তদানের সময় রক্তদাতার তাপমাত্রা ৯৯.৫ ফারেনহাইটের নিচে এবং নাড়ির গতি ৭০ থেকে ৯০ এর মধ্যে এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকতে হবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে রক্তের হিমোগ্লোবিন প্রতি ডেসিলিটারে ১৫ গ্রাম এবং নারীদের ক্ষেত্রে ১৪ গ্রাম হওয়া দরকার। রক্তদাতাকে অবশ্যই ভাইরাসজনিত রোগ, শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং চর্মরোগ মুক্ত থাকতে হবে।

রক্ত দেয়ার উপকারিতা

১. এতে একজন মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব।

২. নিয়মিত রক্তদাতাদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে।

৩. বছরে তিনবার রক্ত দিলে শরীরে নতুন লোহিত কণিকা তৈরির হার বেড়ে যায়। এতে অস্থিমজ্জা সক্রিয় থাকে। দ্রুত রক্ত স্বল্পতা পূরণ হয়।

৪. রক্তে কোলেস্টরেলের মাত্রা কমে যায়, এতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

৫. রক্ত দিলে যে ক্যালোরি খরচ হয়, তা ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬. শরীরে হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, জন্ডিস, ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, এইচআইভি বা এইডসের মতো বড় কোন রোগ আছে কি না, সেটি বিনা খরচে জানা যায়।

৭. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

বই রিভিউ: ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা

লেখক: ড. জাফর ইকবাল

প্রকাশক: সময় প্রকাশন

রিভিউয়ার: মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

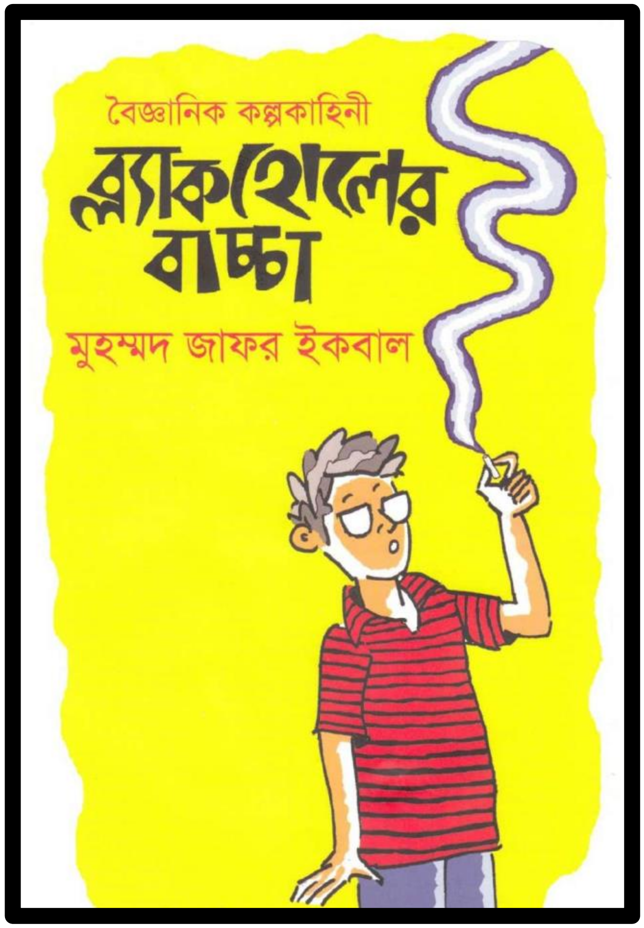

বাংলাদেশি সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর জগতে জাফর ইকবালের বেশ খ্যাতি রয়েছে। তার লেখা বৈজ্ঞানিক গল্পগুলো পাঠক সমাজে বেশ পরিচিত। আজ তার লেখা তেমনই এক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর বই নিয়ে লিখছি। বইয়ের নাম ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা। ব্ল্যাকহোল তো সবাইই চিনি। তবে এর যে বাচ্চাও হতে পারে তা হয়তো আমাদের জানা নেই। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। বইয়ে এ বিষয়ে পড়ব আমরা।

গল্পটা এক নামকরা স্কুল, অক্সব্রীজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এক ছাত্র মিঠুনকে কেন্দ্র করে। অক্সব্রীজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল হল ধনী শ্রেণির স্কুল। মিঠুনের পরিবারও ধনী। তবে সে ৮ম শ্রেণিতে পড়লেও বিজ্ঞান বিষয়ে তার আগ্রহ তুঙ্গে। পুরো বইয়ে দেখা যাবে মিঠুনেরই রাজত্ব। তবে মিঠুনকে বিশেষ কারণে তার স্কুল ছেড়ে কাছের এক অখ্যাত স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে তার পরিচয় হয় কয়েকজন শিক্ষার্থী বগা, ঝুম্পা, ফারাদের সাথে। তাদের সাথেই গড়ে ওঠে সখ্যতা।

ঘটনাপ্রবাহ এভাবেই চলতে থাকে। মিঠুন তার ক্লাসের বন্ধুদেরকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জিনিসও শেখাতে থাকে। ধীরে ধীরে মিঠুনের চমৎকারিত্ব দেখা যায়। মিঠুন নিজ প্রচেষ্টায় তৈরি করে ফেলে বৈপ্লবিক এক জিনিস! সেটা নিয়েই গল্প এগোয়। এই রহস্যময় জিনিস সম্মন্ধে জানতে পড়তে হবে বইটি।

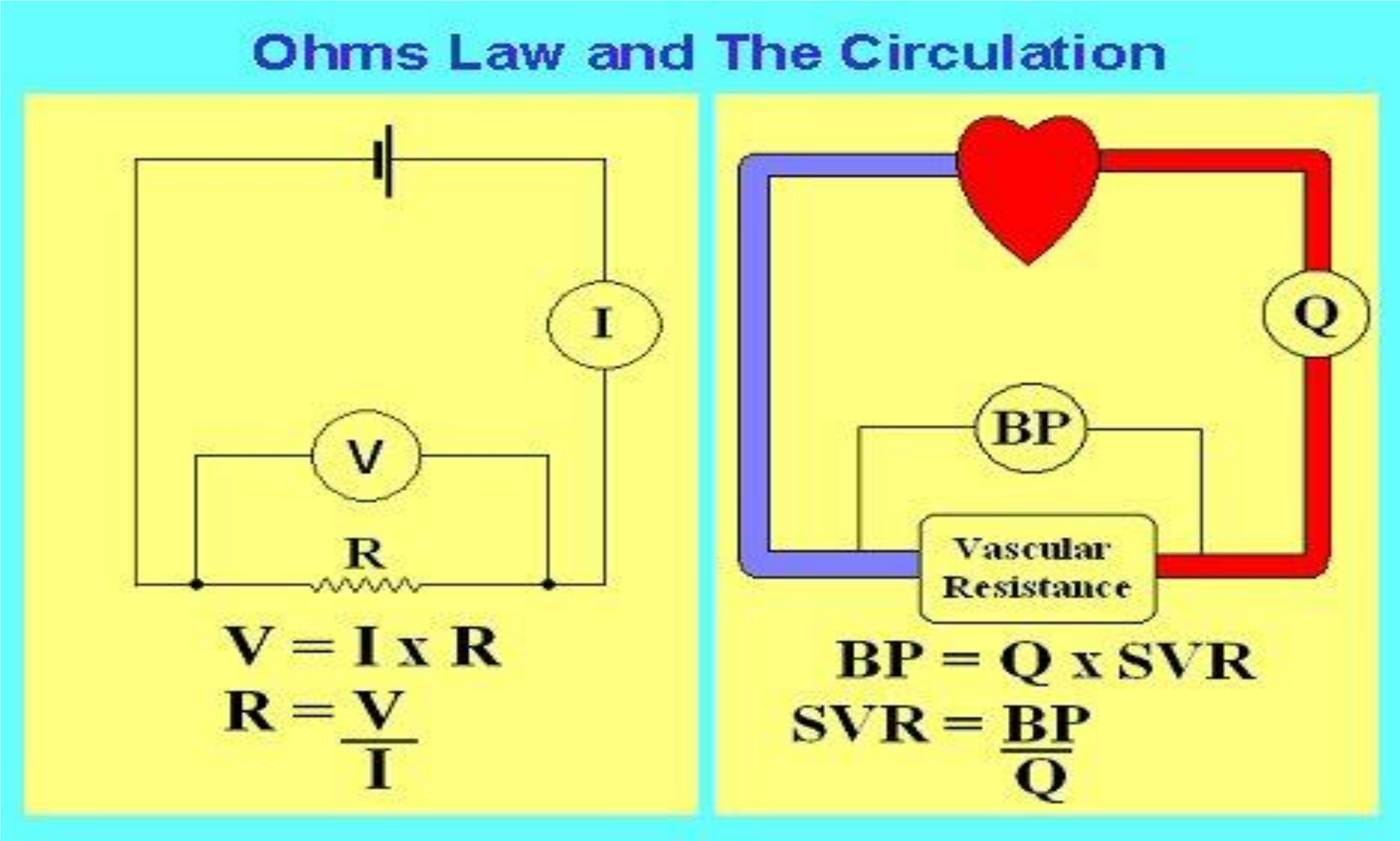

ওহমের সূত্র যখন আমাদের রক্তনালীতে

মো. আশরাফুল হাসান এনাম

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আমরা মাঝে মধ্যেই দেখতে পাই একটি জিনিসের সূত্র অবিকল অন্য আরেকটি জিনিসে ব্যাবহৃত হচ্ছে। নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র আর কুলম্বের আধান আকর্ষন (কুলম্ব বল) এর সূত্র যেন একই সূত্র খালি চিহ্ন আলাদা একই ভাবে গতিশীল বস্তুর বেগ সরণ ত্বরণের সূত্র, ঘুর্ণয়ণশীল বস্তুর সূত্র গুলোর সাথে যেন অবিকল মিলে যায়। আজ আমরা দেখবো কীভাবে তড়িৎবিজ্ঞান ও তড়িৎচুম্বকত্ব ও বর্তনী প্রকৌশলের অন্যতম গুরত্বপূর্ণসূত্র 'ওহমের সূত্র' কীভাবে মানবদেহের রক্ত সংবহন তন্ত্রের গতিবিদ্যা 'হিমোডাইনামিক্স' এর সাথে অবিকল মিলে যায়।

১৮২৭ সালের মে মাসে জার্মান বিজ্ঞানী 'জর্জ সাইমন ওহম' তার প্রকাশিত Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet এ বলেন যে, "কোন একটি বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক" যার গাণিতিকরুপ $I = V/R$, এখানে I তড়িৎপ্রবাহ, V দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এবং R নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বর্তনীর পরিবাহীর রোধ।

রক্ত সংবহন তন্ত্রে, রক্ত প্রবাহ Q রক্তনালীর দুই প্রান্তের রক্তচাপ পার্থক্যের সমানুপাতিক।

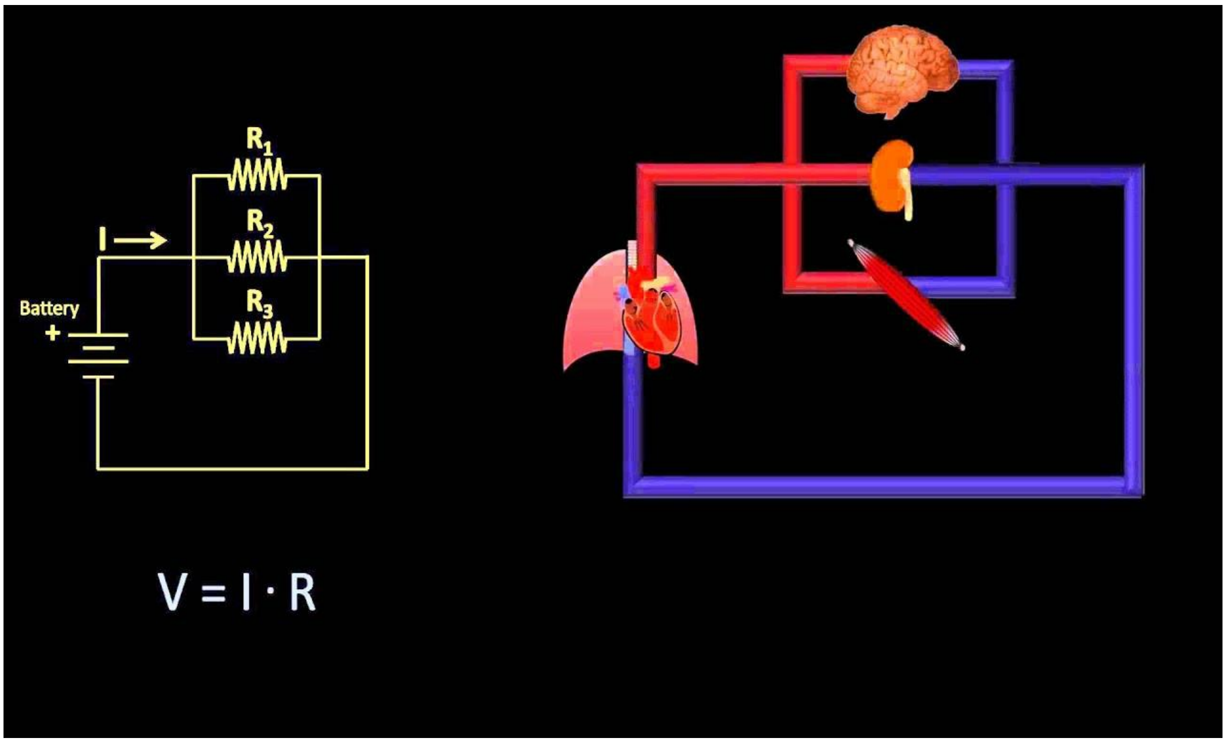

ওহমের সূত্রের মতোই এখানে তড়িৎ প্রবাহের স্থানে রক্তের প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্যের স্থানে রয়েছে রক্তচাপ পার্থক্য এর গাণিতিকরূপ $Q = P/R$ যেখানে Q রক্তপ্রবাহ, P রক্তচাপ পার্থক্য, এবং R = রক্তপ্রবাহে গতির মুখে বাধা সার্বিক ভাবে চিন্তা করতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ রক্তসংবহন তন্ত্রই অনেকটা তড়িৎবর্তনীর মতো।

যেখানে হার্ট পালন করে ব্যাটারীর দায়িত্ব পরিবাহীর দায়িত্ব পালন করে রক্তনালী রোধকের স্থানে থাকে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ গুলো ব্যাটারির দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মতো হার্টের দুই প্রান্তের রক্তচাপ পার্থক্য গড় ধমনীচাপ বা MAP (Mean Arterial Pressure) ও কেন্দ্রীয়শিরাচাপ বা CVP (Central Venous Pressure) এর পার্থক্যের সমান। ব্যাটারি থেকে বের হওয়া তড়িৎপ্রবাহের ভূমিকা পালন করে Cardiac Output বা CO। এটি প্রতি সিস্টোলে হার্ট থেকে বেড়িয়ে আসা রক্তের পরিমান।

বর্তনীতে রোধ R যেমন তড়িৎ প্রবাহের বাধার পরিমাণ, রক্ত সংবহনের ক্ষেত্রে R তেমনই রক্ত প্রবাহের বাধার পরিমানকে গাণিতিক ভাবে প্রকাশ করে এই R পরিমাপ করা হয় পয়েজের সূত্র দ্বারা যা কোন নলে প্রবাহীর বাধার পরিমান বের করা যায় এর গাণিতিক রূপ $R = 8Vl/\pi r^4$

এখানে,

V = প্রবাহীর সান্দ্রতা, l = নলের দৈর্ঘ্য, r = নলের ব্যাসার্ধ এবং R = প্রবাহীর বাধা

পুরো দেহের সব অঙ্গের তুল্য প্রবাহ বাধাকে বলা হয় Systematic Vascular Resistance (SVR)।

সুতরাং দেহ বর্তনী, রক্ত সংবহনতন্ত্রের সূত্র দাঁড়ায়

MAP−CVP = CO x SVR

সুস্থদেহে CVP অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয় তাই একে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়।

সুতরাং CO = MAP/SVR

POISEUILLE'S LAW

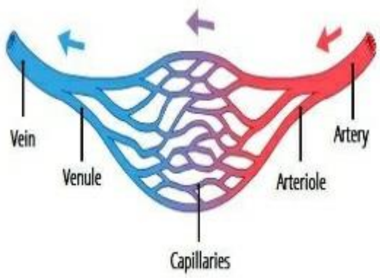

$$Q = \frac{\pi \Delta P r^4}{8 \eta l}$$

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই পরিমাপ গুলোর তাৎপর্য অত্যাধিক রক্ত আমাদের দেহে পুষ্টি এবং অক্সিজেনের সরবরাহ করেতথা শক্তির সরবরাহ করে দেহের বিভিন্ন প্যাথলজিকাল অবস্থা এই রক্ত প্রবাহে অস্বাভাবিকতার কারণ হতে পারে।

যেমন অধিক রক্তক্ষরণ এর কারণে কমে যেতে পারে CO এর পরিমাণ ফলে হ্রাস পেতে পারে রক্তচাপ অথবা হার্ট ঠিক মতো পাম্প করতে না পারলে কমে যায় MAP এর মান ফলে সমান প্রবাহ বাধায় হ্রাস পায় CO হ্রাস পেলে দেহ শক্তি পাবে কম. তৈরি হবে দূর্বলতা, এজন্য হার্টের বিভিন্ন ওষুধ বা হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যাবহার করা হয় পেসমেকার।

$$Q \alpha \Delta P$$

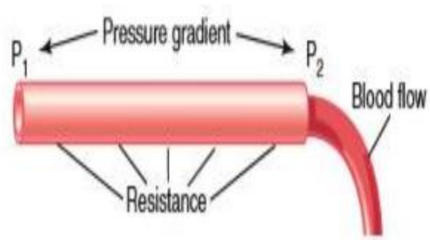

$$Q = \frac{\Delta P}{R}$$

Ohm's law

$$Q \alpha \frac{1}{R}$$

পয়েজের সূত্র থেকে আমরা দেখি যে R রক্তের সান্দ্রতার সমানুপাতিক আর রক্তনালীর ব্যাসার্ধের চতুর্ঘাতের ব্যাস্তানুপাতিক, অর্থাৎ রক্তের সান্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে বাড়বে রক্ত সংবহনের বাধা আর রক্ত নালী যদি সংকুচিত হয়ে অর্ধেক হয় SVR বৃদ্ধি পাবে ১৬ গুণ! সিমপ্যাথিটিক নার্ভের বিভিন্ন ক্রিয়ার কারণে ঘটতে পারে এই সংকোচন। একে স্বাভাবিক করতে ব্যাবহার হয় বিভিন্ন মেডিসিন।

আমাদের দেহের জন্য স্বাভাবিক রক্তচাপ ১২০-৮০ মিমি পারদচাপ এ চাপ বজায় রাখতে MAP, CO, SVR এবং রক্তনালীর ব্যাসার্ধকে একটি অপটিমাম মান বজায় রাখা জরূরীকোন অসুস্থ ব্যাক্তির অস্বাভাবিক রক্তচাপের কারণ সন্ধানে দরকার এদের মান সঠিক ভাবে কারণ সন্ধান করা গেলেই এদের স্বাভাবিক করতে ব্যাবহার করা যায় মেডিসিন এজন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ সূত্রের তাৎপর্য অনস্বীকার্য। ফরাসী বিজ্ঞানী রেনে দেকার্ত একদা বলেছিলেন,

"মানবদেহ কে একটি যন্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়।"

স্পষ্টতই এই কথা এখন আমরা স্বীকার করে নিতে পারি. মানব দেহ যখন তার ছোট আয়তনে পদার্থবিজ্ঞান আর প্রকৌশলের এতো সব নীতিকে ধারণ করে তখন এটা স্বীকার করেই নিতে হয় যে,

মানবদেহ শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী সৃষ্টিকর্তার এক 'ইঞ্জিনিয়ারিং মারভেল'।

পিকআপ কথন

শিফাজ আহমেদ

পিকআপ

পিকআপ হলো ইলেকট্রিক গিটার এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একে ইলেকট্রিক গিটারের প্রাণের সাথে তুলনা করা যায়। তারের কম্পনগুলি পিকআপের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত হয় এবং এই সংকেতটি তখন একটি পরিবর্ধক ও স্পীকারকে প্রেরণ করা হয়, যা আমরা পরবর্তীতে শুনতে পাই।

কিভাবে গিটারে পিকআপ যুক্ত হল?

গিটার দুটি অংশ নিয়ে গঠিত: নেক এবং বডি। স্ট্রিংগুলি নেক থেকে বডিতে ব্রিজে যুক্ত হয়। যখন একটি স্ট্রিং স্ট্রাম করা হয় তখন তার কম্পনটি ব্রিজ থেকে সঞ্চারিত হয়, গিটারের বডিতে অনুরণন করে। গিটার এর বডির ভেতরের বাতাস ও বাইরের বডি সংলগ্ন বাতাস একই কম্পনে কম্পিত হয় ও আমরা শুনতে পাই। শুধু একটি স্ট্রিং বায়ুতে তেমন কোন কম্পন সৃষ্টি করতে পারেনা।

১৮৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে, ষ্টীল স্ট্রিং এর স্প্যানিশ স্টাইলের গিটারগুলিতে প্রদর্শিত হতে শুরু করে যা উল্লম্বভাবে ধরতে হত। এর ফলে যুক্ত হয় উচ্চ শব্দ ও একটি উজ্জ্বল টোন। তবে এই স্ট্রিং নেক ও বডিতে টান সৃষ্টি করত যার ফলে নেক বেঁকে যেত, কখনো ভেঙ্গে যেত। 'এক্স-ব্র্যাকিং' গিটারকে শক্তিশালী করার জন্য এক্স (X) আকারে নতুন নকশা ও নেক শক্তিশালী করার জন্য ট্রাস রডের ব্যবহার চালু করে। ট্রাস রড হলো নেকের অভ্যন্তরে একটি স্টিলের রড যা স্ট্রিংগুলির নেক ও বডির মাঝের টানকে মোকাবেলা করে। এত ডিজাইন উন্নতির পরও গিটার তখন অন্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে ভলিউমে প্রতিযোগিতা করতে পারত না। অন্যসব বাদ্যযন্ত্রের সাথে এর শব্দ শোনা যেত না বলে জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার কমতে থাকল।

এরপরে গিটার থেকে আরও ভলিউম বর্ধিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। নতুন উপকরণ ব্যবহৃত হত এবং অ্যাকোস্টিক গিটারের নকশা পরিবর্তন করা হয়েছিল। এর আশেপাশে -1927 রেজোনেটর গিটার আসে যার ফাঁপা বডিতে স্ট্রিংএর নীচে বড় অ্যালুমিনিয়াম কোন যুক্ত ছিল। এই অনুরণক গিটার প্রচলিত অ্যাকোস্টিক গিটারের থেকে প্রায় ৩-৫ গুণ জোরে প্রশস্ত শব্দ করত। তবে ওজন বেশি ছিল এবং এর পূর্বসূরীর চেয়ে শব্দের গুণমান আলাদা ছিল।

৯৩০ সালে বিউচ্যাম্প এবং তার বন্ধু পল বার্থ স্টিলের খুঁটি ও তার দিয়ে দুটি চৌম্বকের উপর ভিত্তি করে একটি পিকআপ তৈরি করেছিলেন যার প্রতিটি স্ট্রিং এর শব্দ পৃথকভাবে বিবর্ধিত করা যেত। এই পিকআপ ব্যবহার করে একটি হাওয়াইয়ান স্টাইলের ল্যাপ গিটার বানানো হয়েছিল যার ডাকনাম "ফ্রাইং প্যান"।

গিবসন লুথিয়ার্স পিকআপটিকে আরও উন্নত করতে ও স্প্যানিশ স্টাইলের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে তারা একটি পিকআপ বিকশিত করেছিল যেখানে প্রতিটি স্ট্রিংয়ের জন্য পৃথক মেরু টুকরোগুলির পরিবর্তে একটি শক্ত বার চৌম্বককে একটি কয়েল দিয়ে আবৃত করা হয়। এই নকশাটি প্রাথমিকভাবে হাওয়াইয়ান স্টাইলের গিটারে সংযুক্ত করা হয়েছিল, তবে পরিকল্পনামত দ্রুতই একটি স্প্যানিশ শৈলীতে মানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই গিটারটিকে ইএস-১৫০ (ES–150) বলা হত, যার মানে ইলেকট্রিক স্প্যানিশ (Electric Spanish) , এটিই প্রথম 'সাধারণ' ইলেকট্রিক গিটার।

সাধারন একটি পিকআপ এর গঠন

এই পিকআপে ছয়টি পৃথক চৌম্বক রয়েছে, প্রতিটি স্ট্রিংয়ের জন্য একটি করে। এখানে, চৌম্বকগুলি সরু সিলিন্ডার আকৃতি যার এক প্রান্তটি উত্তর মেরু এবং অন্যটি দক্ষিণ মেরু।

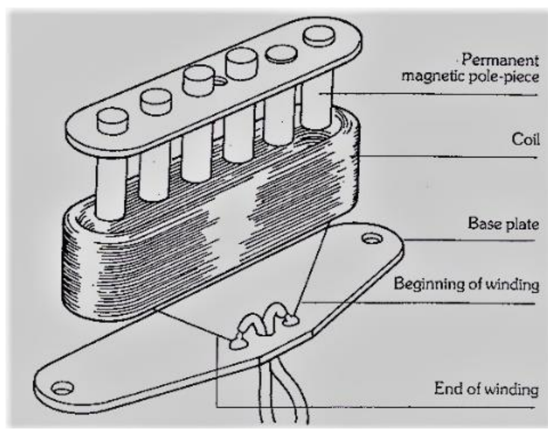

ছয়টি চৌম্বক উপরে এবং নীচে একটি ফাইবার বা প্লাস্টিকের প্লেট দ্বারা নিজ স্থানে রাখা হয়। চুম্বকগুলোর দিক একই রাখা হয় অর্থাৎ, সব গুলের উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু পিকআপে একই ভাবে থাকবে। (উদাহরনঃ সবগুলোর উত্তর মেরু উপরে বা সব গুলের দক্ষিণ মেরু উপরে)

একটি পাতলা কপার তার দিয়ে সরাসরি চৌম্বক গুলির সারির চারদিকে আবৃত করা হয়। সাধারণত ৭-৮ হাজারের বেশি বার প্যাঁচানো হয়ে থাকে। এবং

যে তার দিয়ে কয়েলের মত মোড়ানো হয় এর দুটি প্রান্ত (শুরু ও শেষ) বাইরে বের হয়ে থাকে।

পিকআপ কিভাবে কাজ করে?

গিটার পিকআপে একটি চৌম্বক এবং একটি কয়েল থাকে এবং উভয়ই স্থির অবস্থানে রয়েছে। তাই স্ট্রিংগুলিই একমাত্র নড়াচড়া করতে পারে। গিটারের স্ট্রিংগুলি চৌম্বকীয়ভাবে প্রবেশযোগ্য উপাদান যেমন লোহা বা নিকেল নির্মিত স্ট্রিংগুলি পিকআপের স্থায়ী চৌম্বকগুলির কাছাকাছি থাকার কারণে চৌম্বক হয়ে যায়। এর ফলে স্ট্রিংএর মাঝে ও মেরু সৃষ্টি হয়।

যখন স্ট্রিংটিকে আঘাত করা হয়, এটি নাড়াচাড়া করে ফলে ফ্যারাডের নীতি অনুসারে পিকআপ কয়েলের ফ্লাক্স এর পরিবর্তন হয় ফলে আমরা পাই পরিবর্তনশীল কারেন্ট বা এসি কারেন্ট। এই অনুসারে,

$$\text{বিভব} = -\text{কয়েলের পাক সংখ্যা}\,\frac{\Delta\text{ফ্লাক্স}}{\Delta\text{সময়}}$$

পাশের বিভব বনাম সময় লেখ হতে,

$$\text{কম্পাংক } (f) = \frac{1}{\text{পর্যায়কাল } (\square)}$$

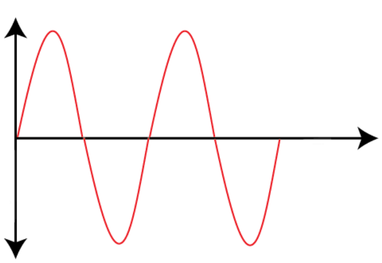

এখানে একটি পর্যায়কালের যে কম্পাংক পাওয়া যাবে তা হবে সেই সময়টিতে স্ট্রিংটিকে আঘাত করার পর তা যে কম্পাংকে কম্পিত হয়েছিল তার সমান। সুতরাং এই বিভব হতে স্ট্রিং এর বিভব সময় (t) কম্পনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে (emf)।

পর্যায়কাল (T)

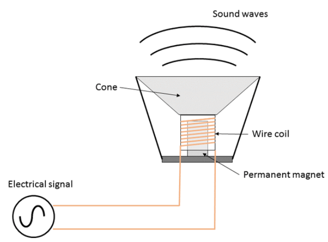

যখন এই বিভব স্পিকারে প্রেরণ করা হয়, তখন এটি ভয়েস কয়েলে প্রবাহিত হয়ে একে চুম্বকে পরিণত করে। গ্রাফের মত সিগনালের ভিন্নতার ফলে ভয়েস কয়েলের চৌম্বকত্ব বাড়ে-কমে ও মেরু পরিবর্তন করে। স্পিকারের চুম্বক বডিতে স্থিরভাবে যুক্ত থাকে। কোনের সাথে যুক্ত চুম্বক কয়েলটি স্থায়ী চুম্বকের সাথে আকর্ষন -বিকর্ষন এর ফলে সামনে পিছনে যাওয়া আসা করে ও কোনটি বাতাসে কম্পন সৃষ্টি করে এবং এর কম্পাংক হয় সেই স্ট্রিংটিকে আঘাত করার পর তা যে কম্পাংকে কম্পিত হয়েছিল তার সমান।

বিভিন্ন ধরনের পিকআপ

সিঙ্গেল কয়েল পিকআপ

সিঙ্গেল কয়েল পিকআপগুলো সাধারণত উজ্জ্বল, পাতলা স্বরের জন্য পরিচিত। এর অর্থ তারা ফাঙ্ক, কান্ট্রি এসব জনরার একটি জনপ্রিয় পছন্দ। এটি রক, পপ এবং ব্লুজ এর জন্যও ভাল।

সিঙ্গেল কয়েল পিকআপগুলোতে হিউমিং এবং নয়েজ এর জন্য এ পিকআপগুলি হাই গেইন/ডিসটর্সন এর জন্য ভাল নয়।

হামবাকার

হাম্বাকারটি একটি দ্বৈত (ডুয়েল) কয়েল ডিজাইন, যা সাধারণত সিঙ্গেল কয়েলের চেয়ে মোটা (ফ্যাট), উষ্ণ (ওয়ার্ম) টোন তৈরি করে। এটি, আরও কম নয়েজ (দ্বিতীয় চৌম্বকীয় কুণ্ডলী যুক্ত করার জন্য) এর অর্থ অনেক গিটারিস্ট হামবাকার পছন্দ করে।

হামবাকারের উচ্চ আউটপুট বলতে বোঝায় যে জনরাগুলিতে হাই গেইন/ডিসটর্সন প্রয়োজন সেখানে এরা নিশ্চিত বিজয়ী।

পি-৯০ (P-90)

পি-৯০ মূলত গিবসনের তৈরি, এর উদ্দেশ্য মূলত সিঙ্গেল কয়েল এবং হাম্বাকার মধ্যে একটি টোনাল মিশ্রণ। গিটারিস্টের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এটি ব্যবহার করেন যাদের সিঙ্গেল কয়েলের সাউন্ড পছন্দ তবে হুমকারের উচ্চ আউটপুট এবং কম নয়েজ ও প্রয়োজন। এর স্বর নিজেই উজ্জ্বল (ব্রাইট) এবং ঘন (থিক), শীর্ষ (ট্রেবল) প্রান্তের স্পষ্টতা সত্ত্বেও খাদ (বেজ) প্রতিক্রিয়া ভাল।

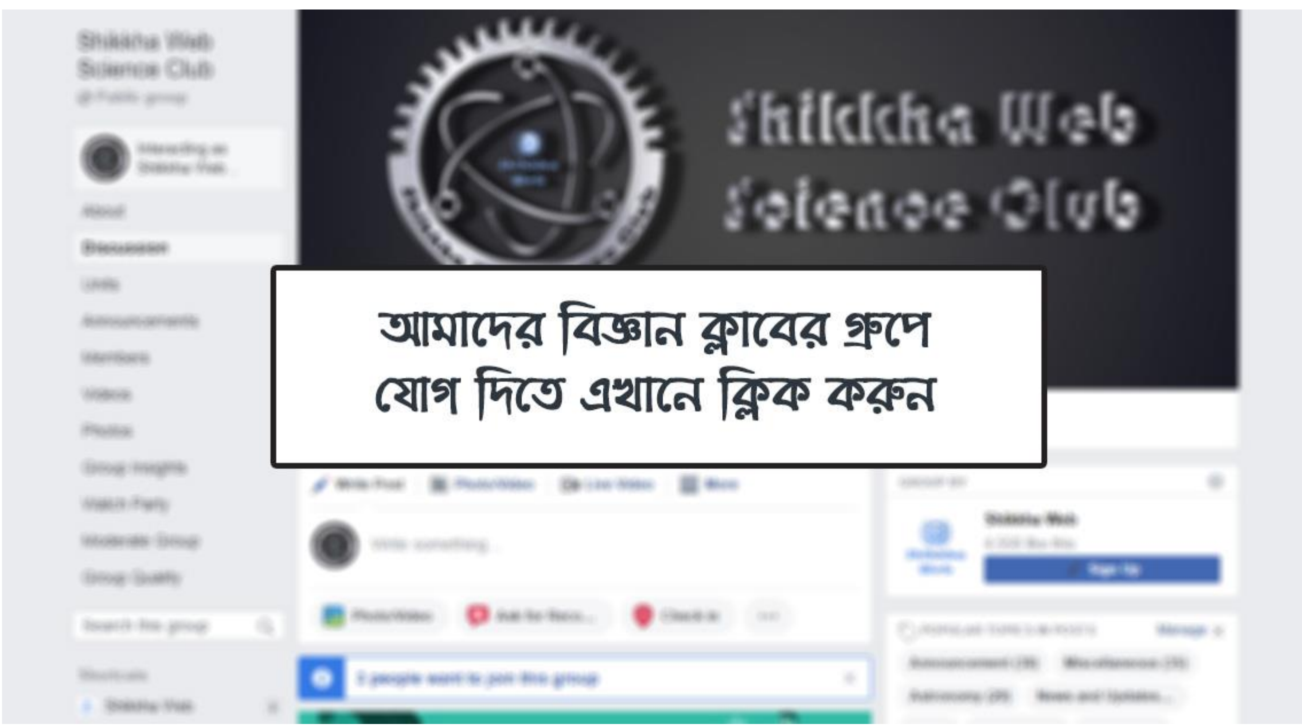

এখানে ক্লিক করে যোগ দিন শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাবের ফেসবুক গ্রুপে এবং বিজ্ঞান চর্চা করুন বাংলা ভাষায়!

করোনা ভাইরাসে পুরুষের আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার মহিলাদের চেয়ে বেশি কেনো?

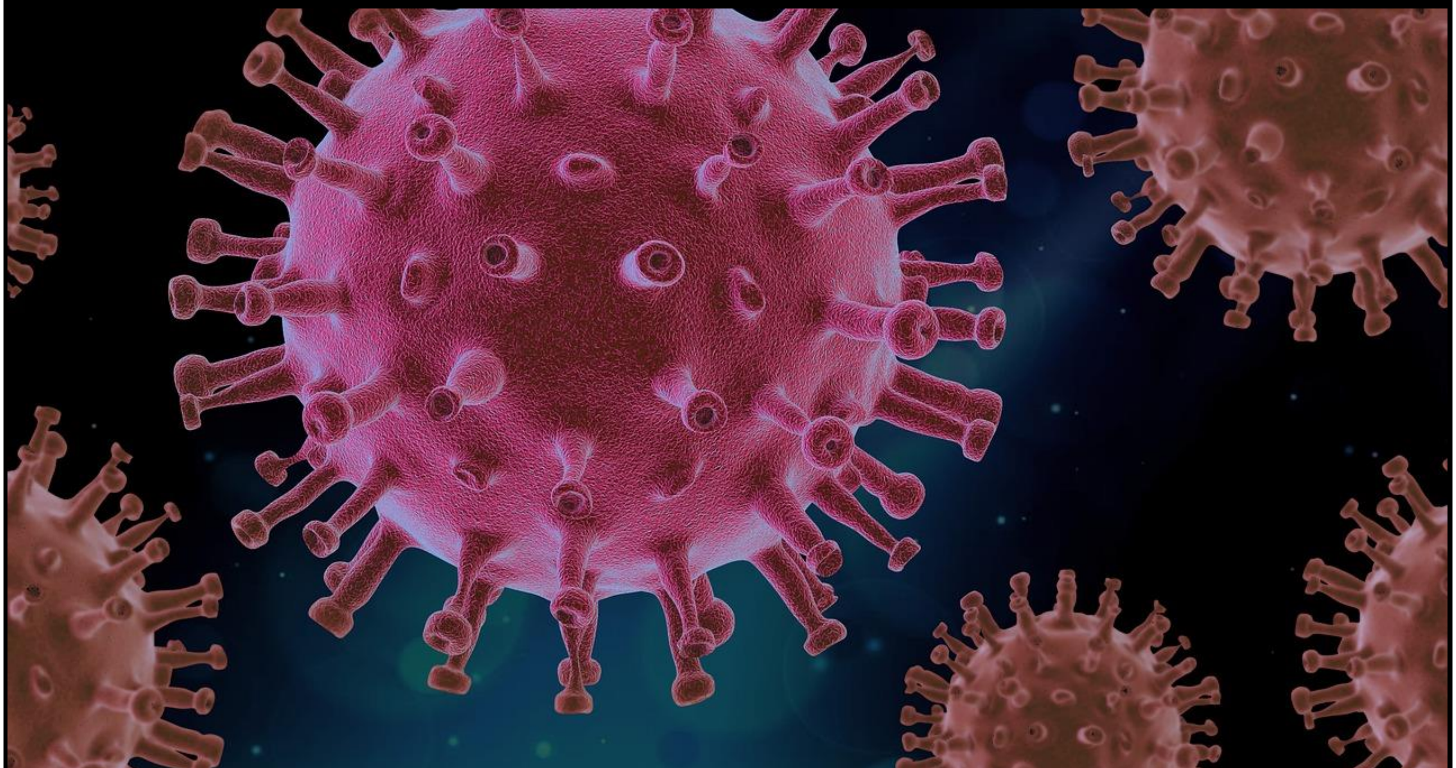

ফারহান কবির

বর্তমান বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া এক মহামারীর নাম করোনা ভাইরাস। এখন পর্যন্ত ১২.৫ মিলিয়নের বেশি মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে ৫.৫ লক্ষেরও বেশি মানুষের। কিন্তু এদের মধ্যে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের বেশি। আজকে আমরা আলোচনা করবো কেনো পুরুষের আক্রান্ত ও মৃত্যুহার মহিলাদের চেয়ে বেশি।

পৃথিবীতে সর্ব স্তরের মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু নারীদের চেয়ে পুরুষরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। উদাহণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাইরাসের প্রভাবে নারীদের চেয়ে দ্বিগুণ পুরুষ মারা যাচ্ছেন। ইতালিতে মোট মৃতদের প্রায় ৭০ ভাগ ই পুরুষ। নিচে কিছু দেশের করোনায় মারা যাওয়া পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাতের একটি চিত্র দেখানো হলো:

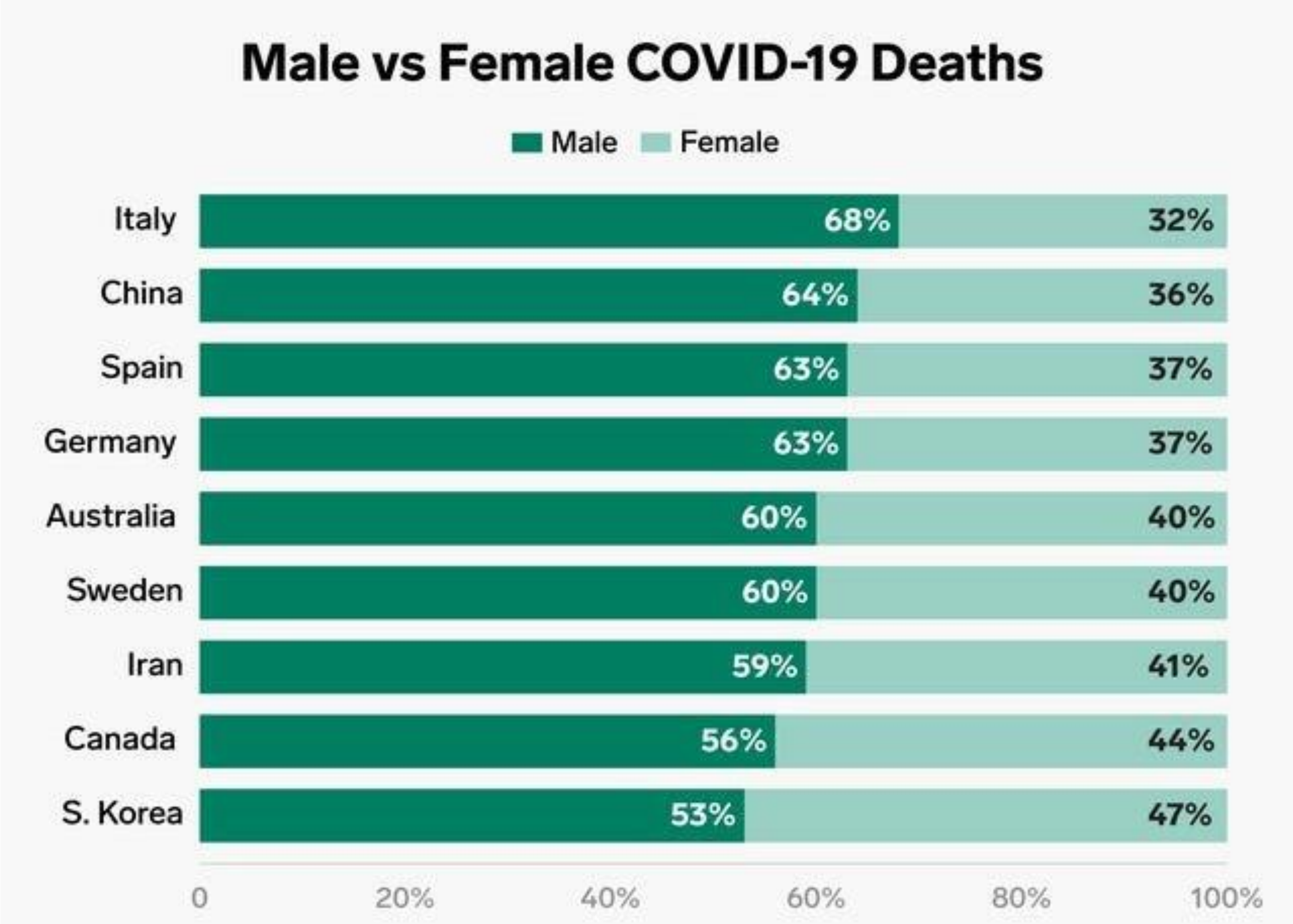

কিন্তু কেনো এমনটা হচ্ছে? একটি মত হচ্ছে নারীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা তথা ইমিউনিটি পুরুষের চেয়ে উন্নত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিউনোলোজির অধ্যাপক ফিলিপ গল্ডারের মতে ভ্যাকসিন এবং সংক্রমণের প্রতি আজীবন প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যে অধিক আক্রমণাত্মক ও কার্যকর। ১০ই মে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে,

পুরুষদের রক্তে ACE2 (Angiotensin-Converting enzyme) এনজাইম বেশি থাকে।

ACE2 এনজাইম করোনা ভাইরাসকে সুস্থ কোষে সংক্রমণে সক্ষম করে তোলে। এটি পুরুষদের নারীদের তুলনায় অধিক আক্রান্ত হবার একটি কারণ হতে পারে। তাছাড়া নারীদের পুরুষদের চেয়ে একটি X ক্রোমোসোম বেশি থাকে। X ক্রোমোসোমে বিশাল সংখক ইমিউন সম্পর্কিত জিন থাকে যা নারীদের ইমিউন সিস্টেমকে আরো সক্ষমতা দান করে করোনা ভাইরাসের বিপক্ষে লড়ার জন্য যেমনটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল SARS এর সংক্রমণের সময়ে।

মহামারীর সময়ে পুরুষের আচরণ ও নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। সাধারণত নারীদের তুলনায় পুরুষরা অধিক ধূমপান করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বের প্রায় ৩৫% পুরুষ ধূমপান করে অন্যদিকে মাত্র ৬% এর বেশি মহিলা ধূমপানে আসক্ত।

নিচে ১৫ বছরের উপরের মানুষদের নিয়ে করা একটি জরিপের চিত্র দেয়া হলো:

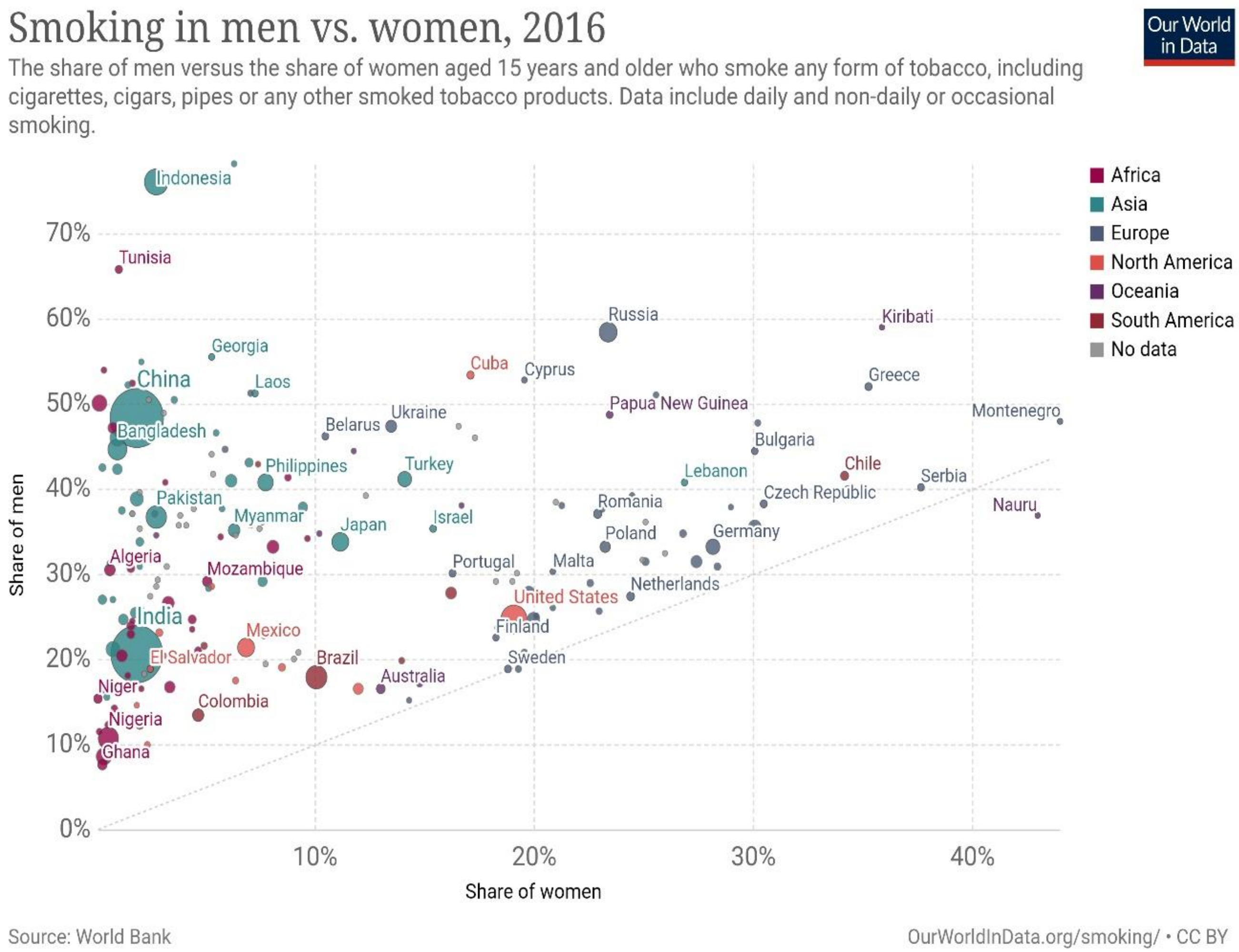

এখনও ধূমপানের সাথে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায় নি। তবে তামাক ধূমপায়ীরা কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকিতে আছেন। কারণ ধূমপানে ঠোঁটের সাথে আঙ্গুলের যোগাযোগ থাকে যা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।তাছাড়া ধূমপানের ফলে একজন ধূমপায়ী ব্যক্তির ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যায় আক্রন্ত হয়।করোনা যেহেতু ফুসফুসে আক্রান্ত করে,   তাই ধূমপান করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

কোনো জনসভায় বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরুষের একজনের সাথে অন্য জনের করমর্দনের মাধ্যমে করোনা ছড়াতে পারে। আমাদের মত দেশে একটি পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সাধারণত পুরুষরাই। কাজের প্রয়োজনে তাদেরকে প্রতিনিয়ত বাইরে বার হতে হয়। এতে করোনায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে।

করোনা সম্পর্কে উদাসীনতা করোনা সংক্রমণের কারণ হতে পারে। অনেক সময় দেহে করোনার লক্ষণ প্রকাশ পেলেও তারা করোনা পরীক্ষা করান না। এর কারণ হতে পারে কিটের অপ্রতুলতা কিংবা করোনায় আক্রান্ত হবার ভয় কিংবা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হবার ভয়। পরীক্ষা করলেও অনেক সময় উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে বা চিকিৎসার খরচ যোগাতে অপারগ হয়ায় তারা চিকিৎসা নিতে পারেন না।

আমাদের দেশেও করোনার প্রভাবে পুরুষের মৃত্যুহার বেশি। আক্রান্তদের প্রায় ৬০ ভাগের বেশি পুরুষ।

শূন্য দিয়ে ভাগ

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

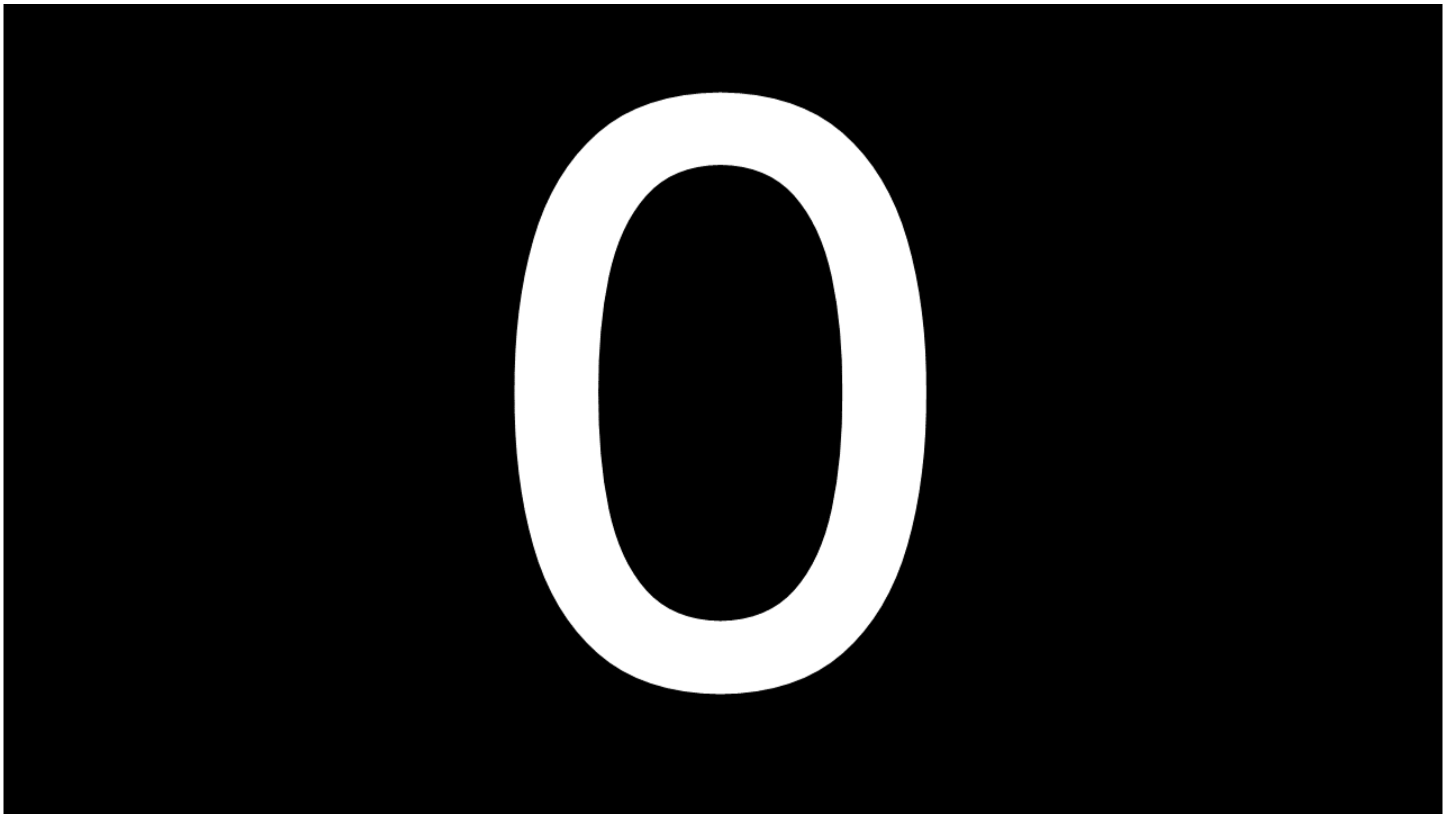

শূন্যকে যেকোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? এটা সবারই জানা। উত্তর হল শূন্য (০)। তাহলে শূন্য দিয়ে কোন সংখ্যাকে ভাগ করলে উত্তর কত? আসলে এটার সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব না। **একটু বড় ব্যাখ্যায় যেতে হবে**।

প্রথমে বিষয়টা একটু বাস্তবিক জ্ঞান দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। সাথে একটু থট এক্সপেরিমেন্ট থাকবে। এতে করে বিষয়টা সহজেই বোঝা যাবে বলে মনে করি। রফিক একটা কেক কিনে আনলো তার বন্ধু শফিকের বাসায়। সেখানে রাজীব, রিজওয়ান ও সাদমান নামের আরো তিন বন্ধু ছিল। মূলত অনেকদিন পর বন্ধুরা মিলে একটা গেট টুগেদার করবে বলেই সবার একত্র হওয়া।

শফিক যখনই কেকটা কাটতে যাবে, অমনি থাকে থামিয়ে দিল রফিক। এখন রফিক একটা ভাষণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সে বললো, "এখানে আমরা বন্ধু যেহেতু পাঁচজন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ভাগও হবে পাঁচটা। এটা তো সহজেই পারবি। যে কেউ পাঁচ ভাগ করতে পারে। আচ্ছা, ধরি পাঁচ ভাগ করব না, করব তিন ভাগ। এটাও কিন্তু আগের মতই সহজ। যে কেউ তিন ভাগে করে ফেলবে। আচ্ছা, কেমন হয় যদি শূন্য (০) ভাগ করি?"

এখন অনেকেই চিন্তিত। তবে দুইজনেই বুদ্ধি খাটিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তর বেরও করে ফেলেছে। এবং তাদের উত্তর হল, "কেকটা ভাগ না করা। তাহলেই শূন্য ভাগ হবে।"

রফিক মুচকি হাসলো। সমাধান শুনে সন্তুষ্ট হওয়ারই কথা। শূন্য ভাগ যেহেতু করব, অর্থাৎ কিছুই করব না। কেকটা যেমন আছে, তেমনই রেখে দিব। তাহলেই শূন্য ভাগ হবে। কেননা শূন্য মানে কিছুই না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এমন চমকপ্রদ যুক্তি একদমই ভুল। রফিক এবার মুখ খুললো, "কেকটা কিছু না করে রেখে দিলে শূন্য ভাগ নয়, বরং এক ভাগ হয়।"

এটা শুনে কয়েকজন আবার চিন্তায় পড়ে গেল। কিছুই করছি না, তাও একভাগ হয়ে গেল! কি ভুতুড়ে কান্ড! অবস্থা সামাল দিতে রফিক বলতে থাকলো, "দেখ, তোরা যদি কেকটা কিছু না করিস তাহলে কেকটা একটা ভাগই থাকবে। যেমন পাঁচজন থাকলে পাঁচ ভাগ করে খাওয়া যায়, তেমনি কেকটা যদি একজনের জন্য হতো, তাহলে ভাগাভাগি লাগতোই না। কেননা সব জিনিসই একভাগ হয়েই থাকে।"

এমতাবস্থায় সাদমানের প্রশ্ন, "তাহলে শূন্য ভাগ কিভাবে হবে? কেকটা ভ্যানিশ করে দিব নাকি!" সবাই এক দফা হেসে উঠলো। "নাকি ভাগই হবে না?", যোগ করলো সাদমান। রফিক আবার শুরু করলো, "না, ভ্যানিশ করতে হবে না। আসলে উত্তরটা হচ্ছে অসজ্ঞায়িত। অর্থাৎ ভাগ করা সম্ভবই হবে না। কারণ ভেবে দেখ, কেকটাকে আমরা এক থেকে অসীম পরিমাণ ভাগ করতে পারি। কিন্তু শূন্যের ক্ষেত্রে সমস্যা। ভাগ করলেও বিপদ, শূন্য টুকরো করা যাচ্ছে না। আবার ভাগ না করলেও বিপদ। কেননা সেক্ষেত্রে আসলে এক ভাগ হয়ে যাচ্ছে।"

রিজওয়ান বলে উঠলো, "অনেক হয়েছে বিজ্ঞান কপচানো। আগে খেয়ে নিই, তারপর সব আলোচনা হবে।" সবাই আরেক দফা হেসে উঠলো।

চলুন ওদের খাওয়ার ফাঁকে আমরা গাণিতিক যুক্তিগুলোও দেখে আসি।

আমরা যেহেতু শূন্য দিয়ে ভাগ করতে পারছি না, সেহেতু এক কাজ করতে পারি। আমরা যেকোনো সংখ্যাকে শূন্যের কাছাকাছি মান দিয়ে ভাগ করতে পারি। এই কাজটাই ক্যালকুলাসে লিমিটিংয়ে বা সীমান্তিক মানে আমরা করে থাকি। ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে কোন একটি মান দিয়ে সমাধান করলে যদি সেটা অসজ্ঞায়িত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা কাছাকাছি মানের প্রয়োগ করে সমাধান করি। তাহলে এক্ষেত্রেও করা যাক!

ধরি, আমরা ৫ কে ভাগ করব ০ দিয়ে। তো শূন্যের কাছাকাছি কিছু মান দিয়ে ভাগ করি। মানগুলো ০.১, ০.০১, ০.০০১ ইত্যাদি হবে। তো শুরু করা যাক।

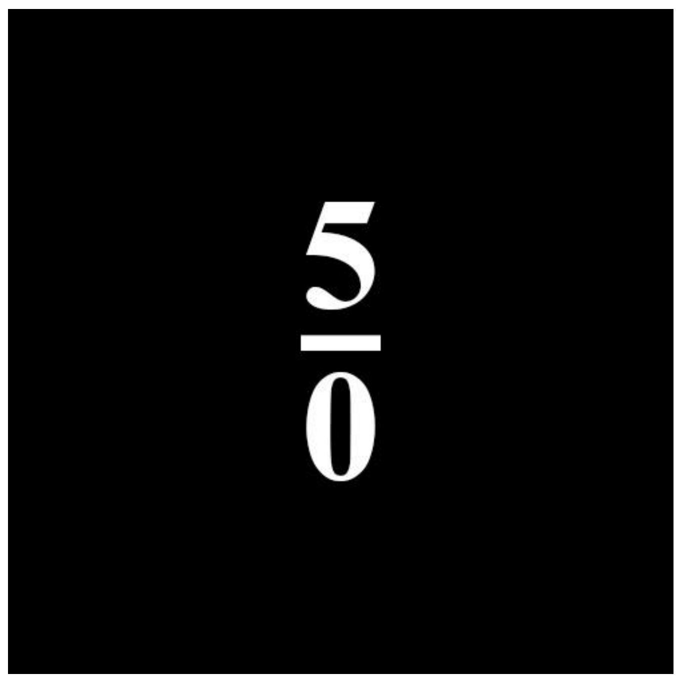

$$\frac{৫}{০.১} = ৫০$$

$$\frac{৫}{০.০১} = ৫০০$$

$$\frac{৫}{০.০০১} = ৫০০০$$

....

$$\frac{৫}{০.০০০০০১} = ৫০০০০০০$$

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তথা শূন্যের যত নিকটে যেতে চাচ্ছি, মান ততই অনেক বড় হচ্ছে। এভাবে একসময় শূন্যের খুব কাছে গেলে ভাগফলটাও ধনাত্মক অসীমের খুব কাছে যাবে। তাহলে আশা করছি এবার সবাই উত্তর দিতে পারবে। তাহলে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কত হবে? নিশ্চয়ই ধনাত্মক অসীম?

আসলে উত্তরটা আংশিক সঠিক। হ্যাঁ, শূন্য দিয়ে ভাগ করলে মান ধনাত্মক অসীম হবে। কিন্তু কথা হল, আমরা শুধুমাত্র ধনাত্মক দিক থেকে ভাগ করেছি। আমাদের আরেকটা পরীক্ষা করা উচিত ঋণাত্মক মান নিয়ে। তাহলে আরেকবার ভাগ করি।

$$\frac{৫}{-০.১} = -৫০$$

$$\frac{৫}{-০.০১} = -৫০০$$

$$\frac{৫}{-০.০০১} = -৫০০০$$

....

$$\frac{৫}{-০.০০০০০১} = -৫০০০০০০$$

উপরে দেখা যাচ্ছে, শূন্যের যত কাছে যাচ্ছি, ততই ঋণাত্মক অসীমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভাগফল। এখন নিশ্চয়ই চিন্তিত সবাই? শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ঋণাত্মক অসীম হবে নাকি ধনাত্মক অসীম? আসলে উত্তর হল দুটোই। অর্থাৎ কোন সজ্ঞায়িত মান পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই একে অসজ্ঞায়িত বলতে পারি।

তাহলে সবসময়ই শূন্য দিয়ে ভাগ করলে অসজ্ঞায়িত? উত্তর হল, না। অনেক ক্ষেত্রেই এর মান ব্যবহার করা হয়। যখন ঋণাত্মক বা ধনাত্মক যেকোনো একটা দিক নিয়ে কাজ করব, তখন এর মান পাব ঋণাত্মক বা ধনাত্মক অসীম। যেমন পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে ভরের আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে আলোর বেগে চললে সমীকরণে নীচে শূন্য হয়। অর্থাৎ শূন্য দিয়ে ভাগ হয়। সেক্ষেত্রে ভরের যেহেতু নেগেটিভ মান নিচ্ছি না, সেহেতু উত্তর ধনাত্মক অসীম ধরি।

আচ্ছা, এবার তাহলে দেখা যাক $\frac{০}{০}$ করলে কত হয়। এখানেও আগের মত অসজ্ঞায়িত বলে দেয়া যায়। কিন্তু এবার আমরা জানি শূন্যকে কিছু দিয়ে ভাগ করতে সেটা ০ হবে। আবার আরো জানি, ভাজ্য = ভাজক×ভাগফল। সেক্ষেত্রে শূন্য সকল সংখ্যা দিয়ে গুন করলেই ভাজ্য শূন্য হবে। আবার আরেক দল দাবি করবে, উপরে নীচে শূন্য কাটাকাটি। উত্তর ১।

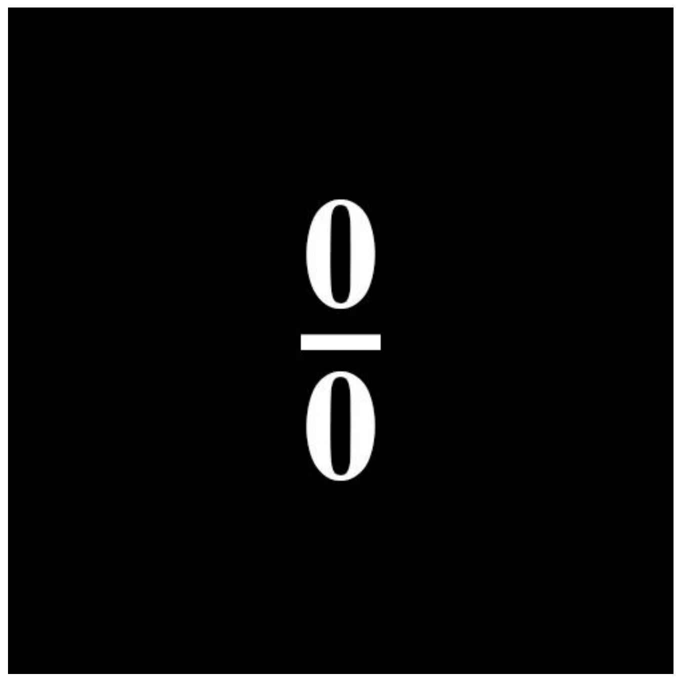

এখন চার রকমের উত্তরের পক্ষে বললে তো অধর্ম হয়ে যাবে। তাই বলব এটা নির্ণয় করা যায় না বা অনির্ণেয়। এটাকে আসর অসজ্ঞায়িতর সাথে মেলালে ভুল হবে। অনির্ণেয় মানে যা নির্ণয় করা সম্ভব না। অন্যদিকে অসজ্ঞায়িত সংখ্যা নির্ণয়যোগ্য হলেও হতে পারে, কিন্তু সেটাকে নির্দিষ্ট মানে সজ্ঞায়িত করা যাবে না।

শূন্য নিয়ে মারামারি আজ এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ।

নীলের রহস্য

সাবিকুন আরা হিমাদ্রী

প্রকৃতিতে নীল রং আমরা অহরহই দেখি। কিন্তু নীল রং কি আসলেই প্রাকৃতিক?

না, নীল রং বিজ্ঞানের ছোট্ট একটা কৌশলে সৃষ্ট রং। সাধারণত প্রকৃতিতে থাকা অনেক রং পিগমেন্ট বা রং সৃষ্টিকারী কেমিক্যাল দ্বারা তৈরি। যেমন - ফ্লেমিংগো পাখি। যখন ফ্লেমিংগো পাখি জন্ম নেয় এরা সাদাটে ধূসর রং বিশিষ্ট হয়।তবে এরা যে কাঁকড়াবর্গীয় খাদ্য গ্রহণ করে, তাতে থাকা ক্যারাটিনয়েড নামক পিগমেন্টের কারণে এরা নিজেদের স্বগোত্রীয়দের ন্যায় গোলাপি বর্ণ ধারণ করে। অথচ নীল রং এর পিগমেন্ট কোনো প্রাণীতে পাওয়া যায় না!

তাহলে নীল রং কি আমাদের দেখা কোনো দৃষ্টিভ্রম?

দৃষ্টিভ্রম নয়, বরং প্রকৃতির নির্ভুল বিবর্তন। নীল রংয়ের কোনো প্রাণী বিশেষ করে পাখির পালক যদি মাইক্রোস্কোপিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায় তবে দেখা যাবে

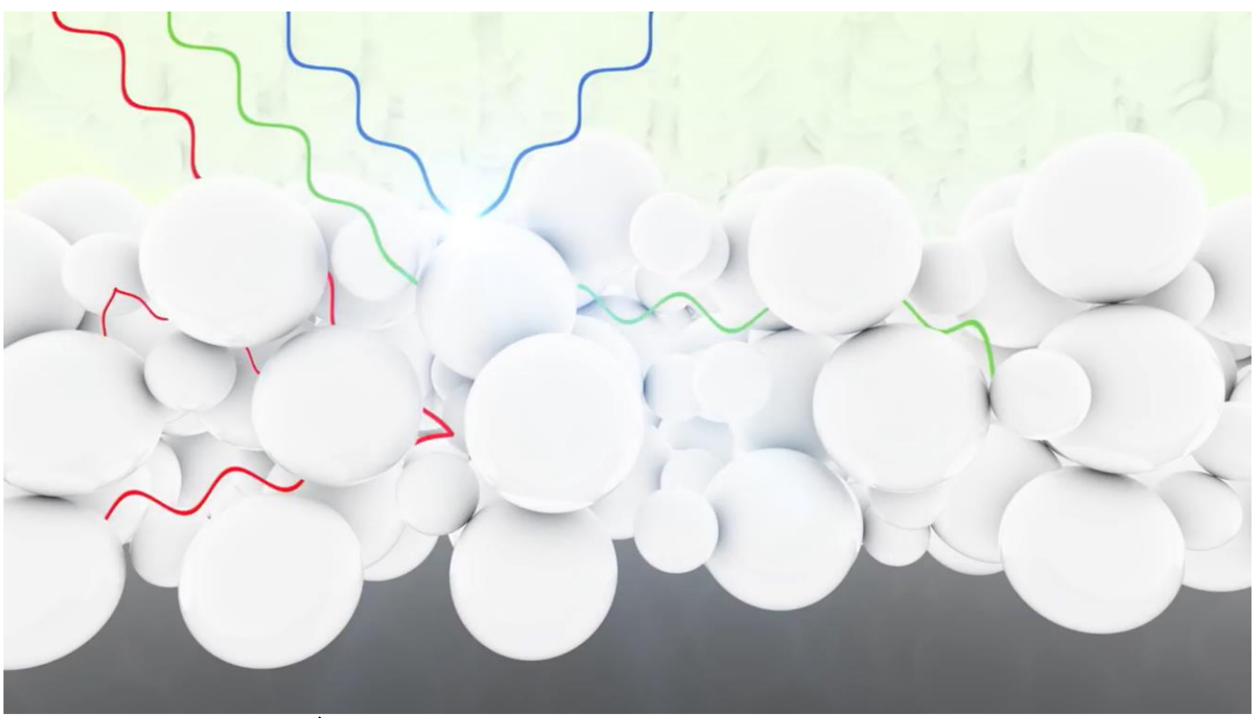

এদের পালক গুলোর কাঠামোতে বাতাসের বুদবুদ বিদ্যমান, যেগুলোর মাঝের দূরত্ব

৫০০ ন্যানোমিটারের চাইতে একটু কম। ফলে খুবই সূক্ষভাবে সূর্যের আলো প্রতিফলন ঘটানোর সময় অন্য সকল আলোকতরঙ্গকে অসমভাবে ছড়িয়ে দিলেও নীল রং সমভাবে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে।

প্রতিটি প্রাণীতেই কমবেশি এভাবেই আলো প্রতিফলিত হয় এবং আমরা নীলরঙা প্রাণী দেখি। ওহ্, হ্যাঁ, নীল পালকগুলোতে পিগমেন্ট নেই তা নয়! কিন্তু পিগমেন্টগুলো আসলে ধূসর, যা নীল রং-কে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে, অন্যান্য আলোকরশ্মি শোষণের মাধ্যমে।

নীলরাঙা প্রজাপতির ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো মজাদার। প্রজাপতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে Lepidoptera বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Lepido অর্থ আঁশ এবং pteron অর্থ পাখা। বলা যায়, প্রজাপতির পাখা অত্যন্ত সাবলীলভাবে সজ্জিত আঁশ দ্বারা তৈরি। এই আঁশগুলোকে দেখতে অনেকটাই ক্রিসমাস ট্রির ন্যায় মনে হয়।

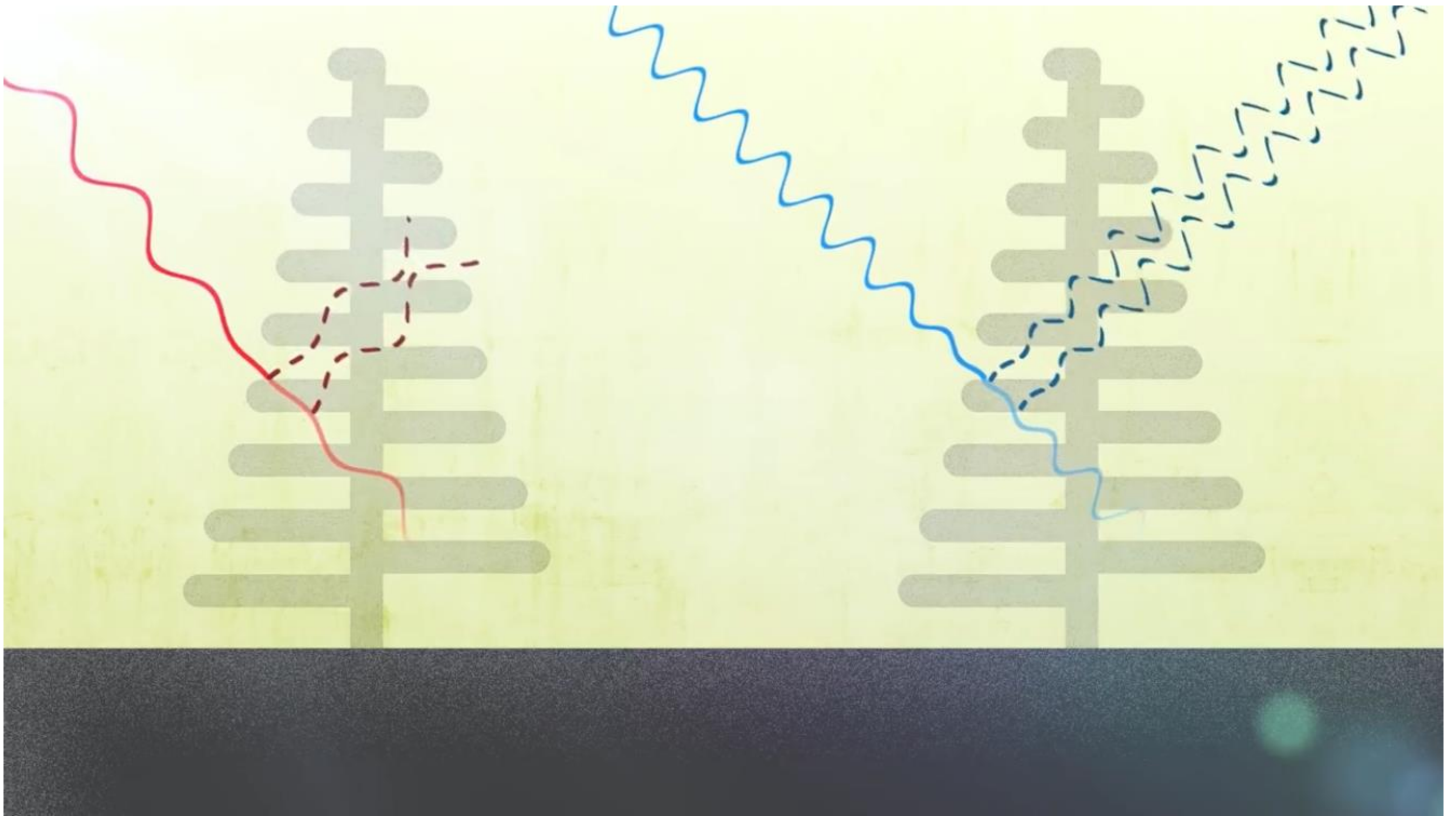

এবং এই বিন্যাসই নীল আলোকতরঙ্গকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে যাতে এই পাখা গুলো নীল দেখায়। আর এই আঁশগুলোর নিচের স্থানগুলো লাল এবং সবুজ তরঙ্গ রশ্মি শোষণ করে নীল রং টিকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে। প্রকৃতি কি তাহলে নীল রং তৈরি করতে অক্ষম?

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, বির্বতনের ফলে জীবদেহে সম্পূর্ণ রুপে নীল পিগমেন্ট তৈরি করা যথেষ্ট কঠিন ছিল। তার চেয়ে পাখি বা প্রজাপতিদের দৈহিক গঠন অতি সহজে পাল্টানো সম্ভব ছিল। তবে প্রকৃতিতে Olivewing নামক এক প্রজাতির প্রজাপতি আছে, শুধু এদের দেহেই নীল রং সৃষ্টিকারী পিগমেন্ট রয়েছে। যেটা নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে।

এভাবেই প্রকৃতিতে নীল রং বিশিষ্ট জীবের দেখা আমরা পাই, যা একই সাথে আমাদের মনোরঞ্জন করে থাকে এবং তাদের এই বৈশিষ্ট্য অভিভূতও করে!

জীবনী: নিকোলা টেসলা

মো. সজীব হোসেন

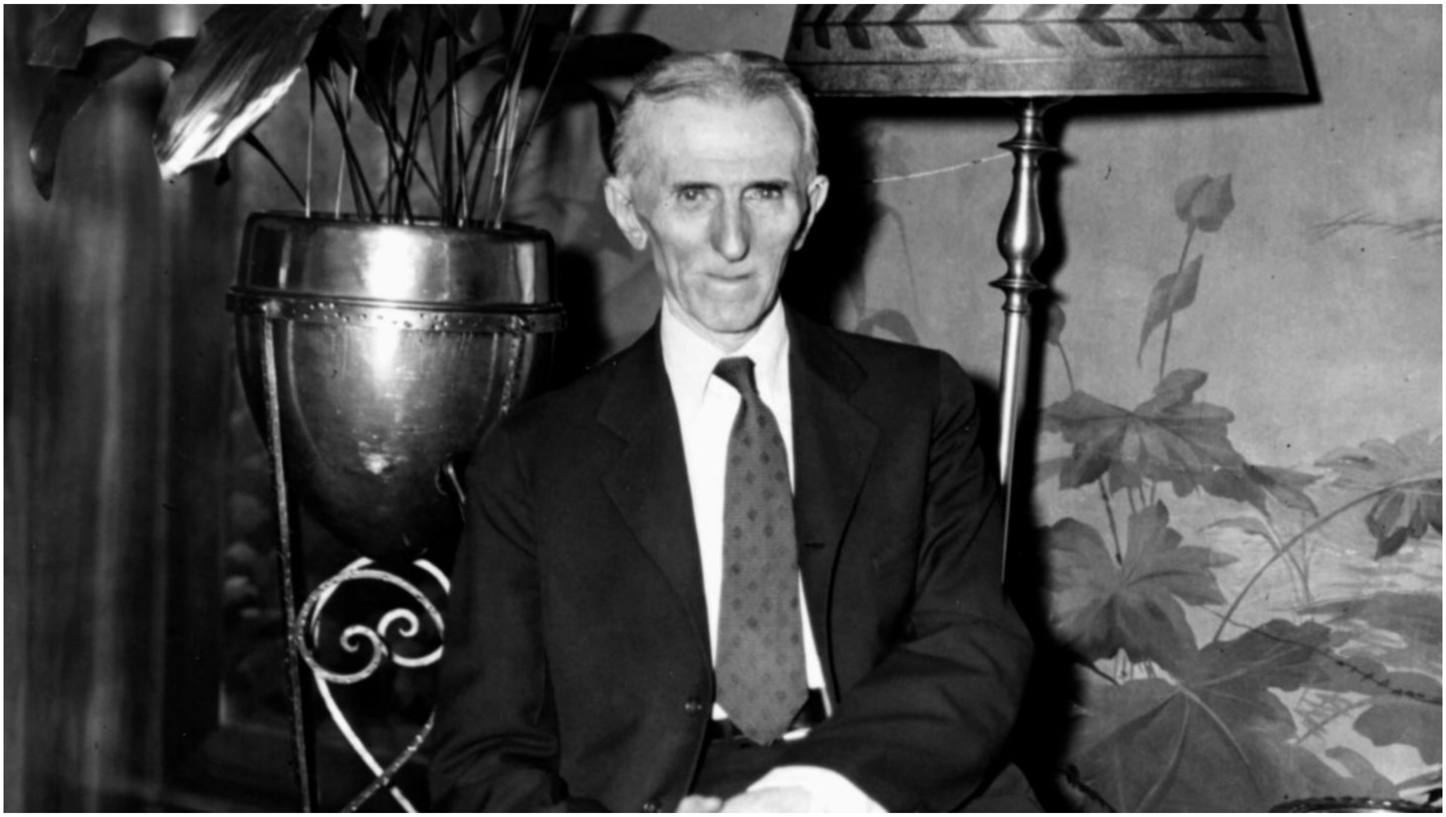

নিকোলা টেসলা ছিলেন একাধারে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানী যিনি AC কারেন্ট সিস্টেমের উদ্ভাবক। তার তৈরি করা AC কারেন্ট আজকে পুরো বিশ্ব রাজত্ব করছে। এজন্যে তাকে "Wizard of Electricity" বলা হয়।

জন্ম

নিকোলা টেসলা ১৮৫৬ সালের ১০ জুলাই বর্তমান ক্রোয়েশিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। এক ঝড় বৃষ্টির অন্ধকার রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এজন্যে তার গ্রামের লোকেরা তাকে ‘Child of Darkness’ বলে ডাকতো আর বলতো এই ছেলে গ্রামের জন্যে অশুভ নিয়ে আসবে। কিন্তু তার মা তাকে ‘Child of Light’ বলতেন। তার মায়ের কথাই সত্য হলো। আজ পুরো বিশ্ব তার আবিষ্কার করা AC কারেন্ট দিয়ে আলোকিত হচ্ছে।

শৈশব জীবন

টেসলা ছিলেন তার মা বাবার ৫ সন্তানের একজন। ছোট থেকেই তিনি অনেক মেধাবী ছিলেন। ছোট বয়সেই তার মার কাছ থেকেই উদ্ভাবনের আগ্রহ পান। তার মা ঘরের প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো জিনিস আবিষ্কার করতো। সেখান থেকেই তার আগ্রহ আসে। তার বাবা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। এজন্যে তার বাবা তাকে একজন ধর্মযাজক হবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করে কিন্তু সে বিজ্ঞানের প্রতি অনেক আগ্রহ থাকার কারণে ওদিকে যায় নি। এখানে একটা মজার কাহিনী আছে যে একদিন টেসলার কলেরা হয়েছিলো। নয় মাস ধরে তিনি অসুস্থ ছিলো। সুস্থ হচ্ছিলো না। তার বাবা যখন বললেন তুমি সুস্থ হলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করবো। তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিজ্ঞানের প্রতি তার অনেকবেশী আগ্রহ থাকার কারণেই বোধহয় তিনি মনের দিক থেকে সুস্থ হয়েছিলো।

শিক্ষা জীবন

নিকোলা টেসলা Graze University of Technology থেকে গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে আর University of Prague এর দর্শন বিভাগ থেকে পড়াশুনা করেন। মজার কথা হচ্ছে তিনি পড়াশুনার শেষ দিকে Graze University of Technology থেকে স্নাতক শেষ না করেই ড্রপ আউট হন। ঘটনা হচ্ছে সে তড়িৎ চৌম্বক আর এসি কারেন্ট নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে স্বাস্থের প্রতি যত্ন না নেওয়ায় অসুস্থ হোন এবং একইসাথে তিনি জুয়ার প্রতি আসক্ত হলে সেখানে পড়াশুনার সব টাকা খরচ করে ফেলেন। এজন্যে তিনি প্রস্তুতির অভাবে পরীক্ষা দিতে পারেনি এবং পড়াশুনার শেষ না করেই ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দেন।

কর্মজীবন

পড়াশুনা শেষ না করেই করে তিনি বুডাপেস্টে চলে যান এবং সেখানে তিনি কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কাজ করেন। এখানে তিনি অনেক কিছুই উদ্ভাবন করেন। এখানে কাজ করার সময়ে তার মাথায় আবেশীয় মোটর এর কথা আসেন। সেটা উদ্ভাবনের অনেক চেষ্টা করেও সাফল্য পান নি। এজন্যে তিনি বুডাপেস্টে ছেড়ে ১৮৮৪ সালে তিনি ইউরোপ থেকে আমেরিকা পারি জমান। আমেরিকা তিনি থমাস আলফা এডিসনের কোম্পানিতে কাজ করেন।

টেসলার উদ্ভাবন

নিকোলা টেসলার অনেক উদ্ভাবন ছিলো। তার উদ্ভাবন গুলাও ছিলো চমৎকার এবং অনেক কার্যকর। আমাদের পৃথিবী তার উদ্ভাবন দিয়েই দিন দিন বদলে যাচ্ছে। তার কিছু উদ্ভাবন এখানে আলোচনা করা হবে। যে AC কারেন্ট দিয়ে আমাদের পৃথিবী আলোকিত হচ্ছে এর কারণ নিকোলা টেসলা। তিনিই AC কারেন্ট সিস্টেমের ডিজাইন করেন। এই কারেন্ট এর বিশেষত্ব হলো এই কারেন্ট অনেক দূর পর্যন্ত সরবরাহ করা যায় এবং বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে এই কারেন্ট দিয়ে কাজ করা সম্ভব। টেসলার কারণেই আজ পানির প্রবাহ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। রেডিও সিস্টেমের উদ্ভাবক ও তিনি। রেডিও ওয়েভ বা বেতার তরঙ্গের কথা বললেই সবাই বিজ্ঞানী মার্কনি এর কথা বলেন। আসলে টেসলাই প্রথমে ১৮৯২ সালে বেতার তরঙ্গ নিয়ে কাজ করেন এবং ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্কে একটা ইলেকট্রিক উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে বেতার চালিত নৌকা প্রদর্শন করেন। সেই উদ্ভাবন দেখেই আজকে রিমোট, মিসাইল তৈরি হচ্ছে। আজকে যে আমরা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে পারছি আবার স্মার্ট ফোন দিয়ে ইন্টারনেট বা ওয়াইফাই ব্যবহার করতেছি এগুলার প্রাথমিক উদ্ভাবক ও নিকোলা টেসলা। এছাড়াও ডায়নামো, টেসলা কয়েল, এক্সরে, রাডার টেকনোলজি, রিমোট কন্ট্রোলার সহ আরো অনেক উদ্ভাবন করেন। শেষ জীবনেও তার একটা উদ্ভাবন ছিলো মানুষের চিন্তা করা জিনিসের ছবির বের করার ক্যামেরা। তার এই উদ্ভাবন প্রকাশ হবার অবশ্যি তার মৃত্যু হয়।

দুইটা বিশেষ উদ্ভাবনের কথা বলতেই হয়। যদিও উদ্ভাবন দুটো সম্পূর্ণ হয় নি।

প্রথমটা হচ্ছে ইলেক্ট্রিকাল টাওয়ার। এই টাওয়ার দিয়ে বিনা তারে ডাটা আর বিদ্যুৎ পুরো বিশ্বে সরবরাহ করা যেত। এতে করে আমরা টাকা ছাড়াই বিদ্যুৎ পেতাম। এই বিশাল প্রজেক্টে কেই বিনিয়োগ করতে চায় নি। তারা কেউই। বিশ্বাস করে নি যে তার ছাড়া বিদ্যুৎ পরিবহন সম্ভব। অনেক কোম্পানির কাছে গিয়েছে এই প্রজেক্টের জন্যে বিনিয়োগ করাতে। কিন্তু কেউ রাজি হচ্ছিল না। অবশেষে মরগান নামের একজন ব্যবসায়ী রাজি হলে ১৯০০ সালের দিকে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে মরগান দেখতে জানতে পারে যে এই প্রজেক্ট থেকে সবাই ফ্রি তে বিদ্যুৎ পাবে এবং এই প্রজেক্টে লাভ হবে না। তাছাড়াও মরগানের অনেকগুলা

ইলেকট্রিক কোম্পানি এবং কপারের কোম্পানির সাথে শেয়ার ব্যবসা আছে। মরগান দেখলো এখানে তার ব্যবসা খারাপ হবে। এজন্যে তিনি প্রজেক্টে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। এতে টেসলার এই প্রজেক্ট সম্পূর্ণ না হওয়াতে আজকে আমরা ফ্রি তে বিদ্যুৎ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলাম। এই প্রজেক্ট সম্পূর্ণ হলে তার এই উদ্ভাবনের জন্যে আমরা প্রযুক্তির দিক দিয়ে একশ বছর এগিয়ে যেতাম। এখানেও মানবতা হেরে গেলো।

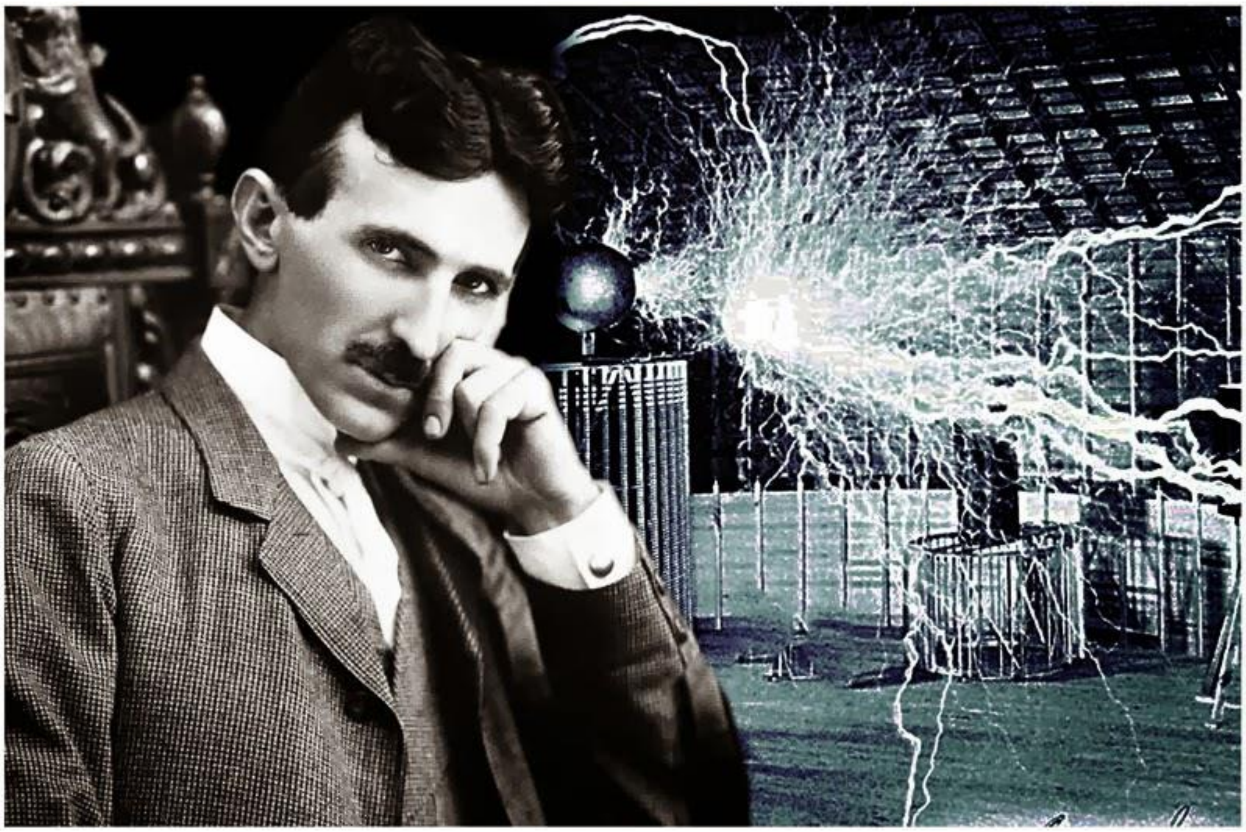

দ্বিতীয় উদ্ভাবন হলো ডেথ রে। টেসলা একটি মেশিন উদ্ভাবন করেন যেটা দিয়ে বিদ্যুৎ রশ্মি দিয়ে ভূমিকম্প সৃষ্টি করা যেতো। একদিন এটা নিয়ে পরীক্ষা করার সময় মেশিনের পাওয়ার বাড়িয়ে দিলে ওই এলাকায় একটা ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এই উদ্ভাবন দেখে লোকেরা তাকে পাগল বিজ্ঞানী বলেন। কিন্তু তিনি এই মেশিনের খারাপ দিক চিন্তা করে মেশিনটা নষ্ট করে দেন। Avengers, Iron Man সহ আরো যেসব মুভি আছে যেখানে সেকেন্ডেই বড় বড় বিল্ডিং ধ্বংস দেখানো হয় সেগুলো শুধু মুভি না বাস্তবেও হতো যদি তার এই উদ্ভাবন মানুষের কাছে পৌঁছানো যেত।

এডিসন আর টেসলার বিদ্যুৎ যুদ্ধ

থমাস আলফা এডিসনের প্রাক্তন নিয়োগকর্তা ব্যাচেলরের সুপারিশে টেসলার চাকরি হয় এডিসনের কোম্পানিতে। এডিসন তখন আমেরিকাতে একজন সফল উদ্ভাবক ও ব্যবসায়ী। এডিসন টেসলাকে দিয়ে অনেক উদ্ভাবন করিয়েছেন। দুজন দুজনের কাজের প্রশংসা করতেন। টেসলা তখনই AC কারেন্ট এর কথা এডিসনকে বলেন। এডিসন তার DC কারেন্ট দিয়ে ভালো ব্যবসা দার করিয়েছেন। এজন্যে তিনি কখনোই চান নি AC কারেন্ট বাজারে আসুক। এটা নিয়ে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের ভাঙন হয়। তখন টেসলা এডিসনের কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে ওয়াশিংটন হাউস এর সাথে মিলে তার নিজের AC কারেন্টের ব্যবসা চালু করেন। মাঝে এডিসন AC কারেন্ট কে বন্ধ করার জন্যে কিছু প্রাণী কে AC কারেন্ট দিয়ে মেরে মিডিয়ার কাছে নেগেটিভ মার্কেটিং করে। কিন্তু AC কারেন্টের ব্যবহার খুবই প্রয়োজন ছিলো কারণ AC কারেন্ট অনেক দূর পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারতো আর বড় বড় কোম্পানিতে বেশি ভোল্টেজ এর মেশিন গুলো DC কারেন্ট দিয়ে চলতো না। সেগুলা চালানোর জন্যে AC কারেন্ট দরকার ছিলো। অপরদিকে DC কারেন্ট এর খরচ ও বেশি এবং এটা অর্ধের মাইলের বেশি পরিবহন করতে পারতো না। এতে করে এডিসনের ব্যবসা কমতে শুরু করে।

আসলেই তার উদ্ভাবন গুলো তার সময় থেকে অনেক উন্নত ছিলো। তিনি ও ছিলেন তার সময় থেকে অনেক এগিয়ে। এজন্যে কিছু মানুষ ভাবত নিকোলা টেসলা ভবিষ্যৎ বলতে পারতো। আজকের যোগাযোগ ব্যাবস্থা এতো সহজ হবার কারণ তার উদ্ভাবন।

টেসলা কখনো তার উদ্ভাবন দিয়ে টাকা কামানোর চিন্তা করেন নি। তিনি চাইতেন তার উদ্ভাবন দিয়ে যাতে মানুষের উপকার হয়।

তার অনেক আবিষ্কারের কোনো পেটেন্ট নেন নি!

সেগুলা অন্য বিজ্ঞানীরা তাদের বলে পেটেন্ট করে নিত। এসব কারণে শেষ জীবনেও টেসলা ছিলো গরীব এবং ঋণগ্রস্ত। ঋণগ্রস্ত থাকার কারণে তিনি ওসিডি নামের একটা মানুষিক রোগে ভুগছিলেন। নিউইয়র্কে, ১৯৪৩ সালে ৮৬ বছর বয়সে করোনারি থ্রমবসিস রোগে আক্রান্ত এই মহান বিজ্ঞানী মৃত্যুবরণ করেন।

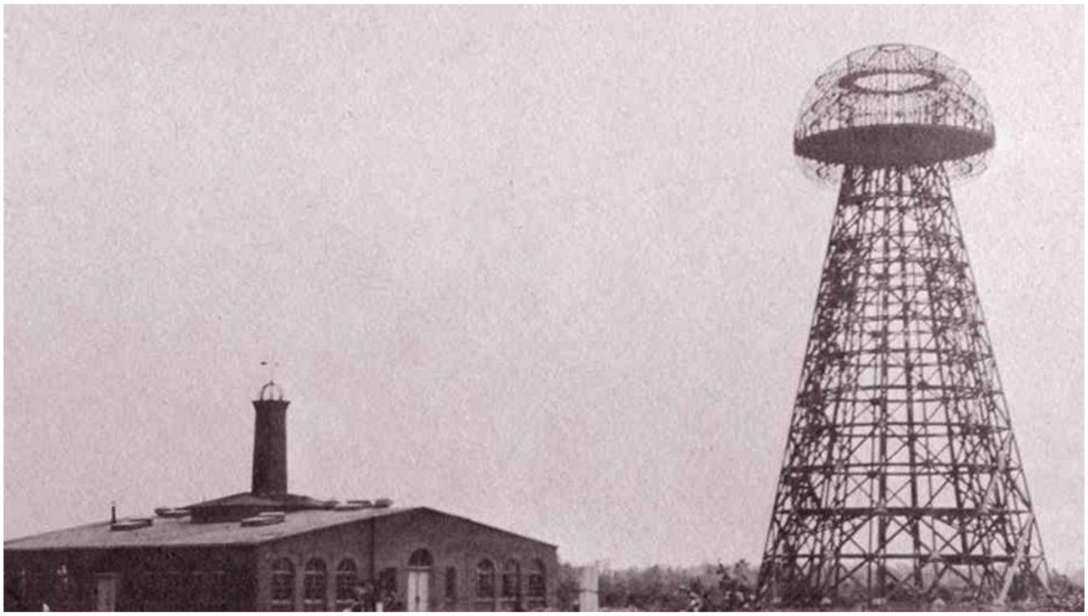

চিত্র: টেসলা টাওয়ার

অ্যাপ রিভিউ

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

০১. MalMath

গাণিতিক কাজে যে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরের ভূমিকা অপরিসীম, সেটা বলার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু বাসার বাইরে সবসময় হাতের নাগালে ক্যালকুলেটর রাখা বিশাল ঝামেলার ব্যাপার। অনেক রকম সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর পাবেন, কিন্তু এটা একদম অন্যরকম। এটা শুধুমাত্র ক্যালকুলেটর ভাবলে চলবে না। এটা আপনার যেকোনো দুর্বোধ্য সমীকরণ সমাধানের জন্য সেরা।

আপনি ক্ষুদ্র থেকে বিশালাকার সমীকরণের সমাধান নিমিষেই করে ফেলতে পারবেন। এতটুকুতেই ঘাবড়াবেন না। এতে আছে ' ধাপে ধাপে সমাধান' নামক সুবিধা। শুধু উত্তর দিয়ে কি কাজ হবে? সমাধানের নিয়মটাও তো শিখতে হবে। যা খুব সহজেই পেরে যাবেন। চাইলে সমাধানকে সেইভ করেও রাখতে পারেন আপনার মোবাইলে। আরো দুটো চমৎকার সুবিধা হল গ্রাফ ও ছবি থেকে সমাধান।

সহজেই গ্রাফের কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন এটা দিয়ে। পাশাপাশি কোথাও লেখা সমীকরণের ছবি তুললেই সমাধান করে দিবে। অর্থাৎ কষ্ট করে সমীকরণ টাইপ করার ঝামেলা একদমই নেই। অর্থাৎ MalMath অ্যাপকে গণিতের এক বিশাল টুলবক্স বললে ভুল হবে।

অ্যাপের তথ্যাদি

নাম: MalMath

রেটিং: ৪.০

ইনস্টলের সংখ্যা: ৫০, ০০, ০০০+

ডাউনলোড লিংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malmath.apps.mm

০২. PicsArt

মোবাইলে ছবি এডিট করবেন? তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় PicsArt একটি অসাধারণ অ্যাপ। কি নেই এতে! মোবাইলে যা রাখা যায়, সবটাই দেয়া হয়েছে। যদিও কম্পিউটারের ফটোশপ বা এ ধরনের এতটা ফিচার নেই। কিন্তু মোবাইলের জন্য বললে নিঃসন্দেহে সেরা তালিকায় স্থান পাবে এটি।

এর সাথে আছে এটির একটি নিজস্ব ক্যামেরা। সেখানেও আছে অনেক অনেক অপশন যা আপনার ছবি তোলাকে করবে আরও সুবিধাজনক। এছাড়াও যাদের আঁকাআঁকি করার শখ, তাদের জন্য সেই ব্যবস্থাও রয়েছে এতে! এর অসাধারণ সব ইফেক্ট দেখলে যে কারোই ভালো লাগতে বাধ্য।

অ্যাপের তথ্যাদি

নাম: PicsArt

রেটিং: ৪.৩

ইনস্টলের সংখ্যা: ৫০, ০০, ০০, ০০০+

ডাউনলোড লিংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio